বিষয় ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনে বর্ণিত
মর্মান্তিক ঘটনাবলী
হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহরাব
(অনার্স হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সউদী আরব

বিষয় ভিত্তিক
শানে নুযূল
ও
আল-কুরআনে বর্ণিত
মর্মান্তিক ঘটনাবলী

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
(অনার্স-হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা,
সৌউদী আরব।

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

প্রকাশনায়

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮ বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ৭১১৪২৩৮, ৯৫৬৩১৫৫

২য় প্রকাশঃ জুলাই ২০০১ইং

কম্পিউটার কম্পোজ

তাওহীদ কম্পিউটার্স এণ্ড পাবলিশার্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা

মুদ্রণে

হাবিব প্রেস লিমিটেড
৯, নবরায় লেন, ঢাকা-১১০০

অফসেট-মূল্যঃ ১৪১/= টাকা মাত্র

Published By Hossain Al- Madani Prokashoni, Dhaka, Bangladesh 2, Edition: July-2001
Price Tk. 141 /= US $: 23

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

"الحمد لله وحده والصلوة والسلام على رسوله الذي لانبي بعده" *

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতী যিন্দেগীর সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরে যেইখানে পরিদৃষ্ট হইয়াছে আধাঁর, যেইখানে দৃষ্ট হইয়াছে অমানবিকতা আর সমাজ গর্হিত কিছু, যেইখানে দেখা দিয়াছে ইহ ও পরকালীন জীবনের জানিতে চাওয়ার কোন প্রশ্ন, ঠিক সেখানেই ঝলকিয়া উঠিয়াছে ওয়াহীর শ্বাশ্বত বিশেষণ—আর ইহার বিঘোষিত নির্দেশনার প্রভাবে সমাজ হইয়াছে কলুষ-কালিমামুক্ত প্রোজ্জল ; বিনির্মিত হইয়াছে বিমল আলোতে সমুদ্ভাসিত শান্তিময় সমাজ।

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে, এই মহাসত্যের আলোক পিন্ড-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত বিধানসমূহ, বিধৃত নাসীহাতপূর্ণ ঘটনাবলী, সর্বোপরি ইহ ও পারলৌকিক জীবনে সুখসন্ধানী তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর জ্ঞানভাণ্ডার হইতে আজিকার মুসলমানগণ বেখবর হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অনুশীলন, অনুসরণ করিয়া মুসলমানগণ একদিন বিশ্বসভায় মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হইয়া থাকিলেও স্বাতন্ত্র হইতে, মৌলিকত্ব হইতে আত্মবিস্মৃত হইয়া কেবল বস্তুতান্ত্রিক জীবনের পিছনে ছুটিয়া আজিকার মুসলমানগণ সর্বত্র লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতেছে।

আমার অনুজ প্রতিম স্নেহ ভাজন **হাফেয শাইখ হুসাইন বিন** সোহ্‌রাব ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি ইসলামী আমল ভিত্তিক মুল্যবান

পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের মাধ্যমে সুপ্ত মুসলিম হৃদয়ে চিন্তা ও চেতনার ফোয়ারা বহাইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার **'বিষয় ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল্-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী'** নামক গ্রন্থ খানার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখার সময়-সুযোগ না পাইলেও আংশিক দেখিয়া আমি যতটা ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়- গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করিবে।

পবিত্র কুরআনের শানে নুযূল ও অন্যান্য ঘটনাবলী কোন নির্দিষ্ট স্থান এবং কালের সহিত সম্পৃক্ত থাকিলেও উহার যাবতীয় বিধানাবলী স্থান, কাল ও পরিবেশের উর্ধ্বে- সর্বস্থান, সর্বকাল ও সর্ব পরিবেশের জন্য শাশ্বত ও চিরন্তন। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিয়া উল্লিখিত গ্রন্থের মাধ্যমে ওয়াহীর শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম পূর্বক জীবন যাত্রার প্রতিটি স্তরে উহার বাস্তবায়নই হইবে লেখকের একনিষ্ঠ শ্রম, অক্লান্ত সাধনা ও অনুপম দ্বীনী খিদমতের পরিপূর্ণ সার্থকতা।

আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। আল্লাহ লেখককে উত্তম পারিতোষিকে পরিতুষ্ট করুন! আমীন।

মোঃ আব্দুস্ সামাদ (কুমিল্লা)
শাইখুল হাদীস (মাদ্রাসাতুল হাদীস)
নাজির বাজার, ঢাকা।
সাবেক অধ্যক্ষ,
কুরপাই সিনিয়র (ফাযিল) মাদ্রাসা,কুমিল্লা।

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া যাঁর অপার মেহেরবানিতে 'বিষয়ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনের মর্মান্তিক ঘটনাবলী' গ্রন্থখানা প্রকাশিত হলো।

পবিত্র কুরআনের বিষয় ভিত্তিক শানে নুযূল সংকলন বাংলাভাষী মুসলমানদেন মাঝে প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ এ জাতীয় পুস্তকের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। তাছাড়া আল-কুরআনের জ্ঞানকে সকল মানুষের কাছে সহজ সরল পন্থায় পৌছে দেয়া এ সময়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

তাই, এ বাসনা বহুদিনের যে- আমরা, আমাদের সন্তানেরা যদি জ্ঞানার্জন করতে পারি সেই মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন' থেকে, যা মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশক এবং যাতে রয়েছে অনেক লৌকিক, অলৌকিক ও মর্মান্তিক ঘটনাবলীর সুনিপুণ বর্ণনা- তাহলে, এই পুণ্য শিক্ষার আলোকপ্রভায় আমরা আমাদের সামগ্রিক জীবনকে গড়ে তুলতে পারব সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং শান্তিময় করে।

আশা করি, সহীহ হাদীসের আলোকে প্রণীত উক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ খানা থেকে আমরা সবাই উপকৃত হব। যাদের লেখা থেকে সহযোগিতা নিয়ে উক্ত গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ হলো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যথাযথ পুণ্য দান করুন। (আমীন)

পাঠক বৃন্দের সহযোগিতা পেলে যে কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সবার নাজাতের কামনা করি এবং দুনিয়াতে সেই রাব্বুল 'আলামীনের নিকট সঠিক পথে চলার তাওফীক কামনা করি। আমীন।

হাফেয হুসাইন
৪১, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন,
বংশাল, ঢাকা।

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কোন্ দিকে ফিরে নামায পড়তে হবে

(১) শানে নুযূলঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসেও ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, অতঃপর তিনি কা'বার দিকে ফিরে নামায পড়তে আদিষ্ট হলেন। এতে ইয়াহুদী, মুনাফিক্ব এবং কোন কোন মুশরিকও নানা প্রকার সমালোচনা করতে লাগলো। এ উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ - يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ *

অর্থঃ- *এখন তো নির্বোধেরা বলবেই যে, তারা (মুসলমানরা) যে দিকে পূর্বে মুখ করত, নিজেদের কিবলা হতে তাদেরকে কিসে ফিরিয়ে দিল? আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন সরল পথ প্রদর্শন করেন।* (সূরা ঃ বাক্বারা- ১৪২)

ব্যাখ্যাঃ- কিবলার শাব্দিক অর্থ মুখ করার দিক। প্রত্যেক ইবাদতে মুমিনের মুখ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র দিকেই থাকে। আল্লাহ্ পবিত্র সত্তা; পূর্ব- পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত, তিনি কোন বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোন ইবাদতকারী ব্যক্তি যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় একদিকে অন্য সময় অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী হতো না।

কিবলার ঐক্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা যদিও যাবতীয় দিকের বন্ধন থেকে মুক্ত, তাঁর জন্য সবদিকই সমান, তথাপি নামাযে সমষ্টিগত ঐক্য সৃষ্টি করার উদ্দেশে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক ঐক্য পদ্ধতি। এতে পূর্ব- পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের সমগ্র মানবমণ্ডলী সহজেই একত্রিত হতে

পারে। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোনটি হবে এর মীমাংসা মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে যাবে। একারণে এর মীমাংসা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়াই বিধেয়।

ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত হয়– সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। কা'বা ঘর তাঁর কিবলাহ্ হোক এটাই তাঁর মনের বাসনা ছিল। এর হুকুম প্রাপ্তির পর তিনি ঐদিকে মুখ করে প্রথম আসরের নামায পড়েন। যেসব লোক তাঁর সাথে নামায পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি লোক মসজিদের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। তথায় লোক রুকুর অবস্থায় ছিলেন। ঐ লোকটি বলেনঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সঙ্গে মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়েছি।' একথা শোনামাত্রই ঐসব লোক ঐ অবস্থাতেই কা'বার দিকে ফিরে যান। কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশের পূর্বে যাঁরা মারা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বহু লোক শহীদও হয়েছিলেন। তাঁদের নামায সম্বন্ধে কি বলা যায় তা জনগণের জানা ছিল না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না।'

———※———

(২) শানে নুযূলঃ- নামাযে কা'বা ঘরের দিকে মুখ করতে আদেশ করা হলে, ইয়াহুদীরা বলতে লাগল, কা'বাই যদি আসল কিবলা হয়ে থাকে, তবে এতদিন বাইতুল মাকদিসের দিকে যে নামায পড়া হয়েছে, তা বিনষ্ট হয়েছে। আর ইতোমধ্যে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াত এ উক্তির অসারতা বর্ণনা করে নাযিল হয়েছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ

الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ـ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَي اللّٰهُ ـ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ*

অর্থঃ- *আর এভাবে আমি তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায় করেছি, যারা মধ্য পন্থার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা অন্য লোকের প্রতিপক্ষে সাক্ষী হও। আর রসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী। আর যে কিবলার দিকে আপনি ছিলেন তাতো শুধু এ জন্য ছিল, যেন আমার নিকট প্রকাশ পায়, কে রাসূলকে অনুসরণ করে আর কে পশ্চাৎপদ হয়। আর এ কিবলা পরিবর্তন বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন (তারা ব্যতীত)। আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান (নামায) বিনষ্ট করবেন। বাস্তবিকই আল্লাহ মানুষের প্রতি খুবই স্নেহশীল, করুণাময়।* (সূরা ঃ বাক্বারা– ১৪৩)

ব্যাখ্যাঃ- হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামায ফরয হয়, তখন কা'বা গৃহই নামাযের জন্যে কিবলা ছিল, না বাইতুল মাক্বদিস ছিল–এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ইসলামের শুরু থেকেই কিবলা ছিল বাইতুল মাক্বদিস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বাইতুলমাক্বদিস কিবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কিবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে হাজরি-আসওয়াদ ও রুকনু-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যাতে কা'বা ও বাইতুল মাক্বদিস উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌঁছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁর মনে কিবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।

অন্যান্য সাহাবী ও তাবে'ঈগণ বলেনঃ মক্কায় নামায ফরয হওয়ার

সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কিবলা। কেননা, ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর কিবলাও তাই ছিল। মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। মদীনায় হিজরতের পর তাঁর কিবলা বাইতুল মাক্বদিস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এরপর প্রথম কিবলা অর্থাৎ, কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।

বনূ-সালমার মুসলমানরা যোহর অথবা আসরের নামায থেকেই কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে নেন। কিন্তু কোবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের নামাযে পৌছলে তারাও নামাযের মধ্যেই বাইতুল মাক্বদিসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ করে নেন।– (ইবনু কাসীর)

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

এখানে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কিবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না।

কোন কোন হাদীস এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামায। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কিবলা বাইতুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে যেসব নামায পড়া হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও মকবূল হয়েছে।

সহীহ্ বুখারীতে ইবনু-আ'যিব (রাঃ) এবং তিরমিযীতে ইবনু-আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কা'বাকে কিবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যেসব মুসলমান ইতোমধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন, তাঁরা বাইতুল মাক্বদিসের দিকে নামায পড়ে গেছেন– কা'বার দিকে নামায পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের কি হবে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

এতে নামাযকে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাযই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কিবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না।

---

(৩) শানে নুযূলঃ- কোন এক সময় কতিপয় মুসাফির রাতে মেঘের ঘন অন্ধকারে কিবলা নির্ণয় করতে না পেরে অনুমানের মাধ্যমে বিভিন্ন দিকে নামায পড়েছিল। পরে দেখা গেল, কারো কিবলা ঠিক হয়নি। মদীনায় এসে তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উক্ত নামাযের ক্বাযা পড়ার অনুমতি চাইলে, নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ-اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ *

অর্থঃ- *আর আল্লাহরই আধিপত্যে পূর্ব ও পশ্চিম। অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহর চেহারা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা (সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান।* (সূরাঃ বাক্বারা- ১১৫)

ব্যাখ্যাঃ- কিবলার দিক সম্পর্কে নামাযীর জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাযী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কিবলা বলে গণ্য হবে। নামায আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে- পুনর্বার পড়তে হবে না।

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সবদিকই সমান। "قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ" পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন। কিন্তু উম্মাতের স্বার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে একটি দিককে কিবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করে সবার মাঝে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে এদিকটি বাইতুল-মাক্বদিসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী

সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কিবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

---

(৪) শানে নুযূলঃ- কিবলা পরিবর্তনের সময় ইয়াহুদী ও নাসারারা এ নিয়েই সমালোচনা করত, কাজেই এখানে আবার নির্দিষ্ট দিকের কথা উল্লেখ করে সতর্ক করে দেয়া হল যে, কিবলা এটাই পুণ্য নয়। এছাড়াও বহু নেক কাজ রয়েছে, সে দিকে মনোনিবেশ কর। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ - وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰي حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ - وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا - وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ - اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا - وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ *

অর্থঃ- সকল পুণ্য এতেই নয় যে, তোমরা স্বীয় মুখকে পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে। বরং পুণ্য তো এটা যে, কোন্ ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি, ফিরিশতাদের প্রতি, কিতাব এবং নবীগণের প্রতি। আর মাল প্রদান করে আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজনকে এবং ইয়াতীমদেরকে এবং মিসকীনদেরকে এবং (রিক্তহস্ত) মুসাফির-দেরকে; আর ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনে। নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করে, আর যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয়, যখন প্রতিজ্ঞা করে বসে। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে অভাব- অভিযোগে, অসুখে- বিসুখে এবং ধর্ম যুদ্ধে; এরাই সত্যিকারের মানুষ এবং এরাই (সত্যিকারের) আল্লাহ ভীরু।

(সূরাঃ বাক্বারা- ১৭৭)

ব্যাখ্যাঃ- মু'মিনদেরকে প্রথমে বাইতুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরে তাদেরকে কা'বা শরীফের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটা কিতাবীদের উপর কঠিন ঠেকে। সুতরাং মহান আল্লাহ এর নিপুণতা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যে দিকে মুখ করার নির্দেশ দেবেন সেদিকেই তাদেরকে মুখ করতে হবে। প্রকৃত ধর্মভীরুতা, প্রকৃত পুণ্য এবং পূর্ণ ঈমান এটাই যে, দাস তার মনিবের সমুদয় আদেশ ও নিষেধ শিরোধার্য করে নেবে। যদি কেউ পূর্ব দিকে মুখ করে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে যায় এবং ওটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ক্রমে না হয় তবে এর ফলে সে মু'মিন হবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে এই আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে।

পূর্ব ও পশ্চিমকে বিশিষ্ট করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইয়াহুদীরা পশ্চিম দিকে এবং খ্রীষ্টানরা পূর্ব দিকে মুখ করতো। সুতরাং উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এটাতো শুধু ঈমানের বাক্য এবং প্রকৃত ঈমান হচ্ছে আমল। মুজাহিদ (রাঃ) বলেনঃ পুণ্য এই যে, আনুগত্যের মূল অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায় এমন অবশ্যকরণীয় কার্যগুলো নিয়মানুবর্তিতার সাথে আদায় করা।' সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তি এই আয়াতের উপর আমল করেছে সে পূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মন খুলে সে পুণ্য সংগ্রহ করেছে। মহান আল্লাহর সত্তার উপর তার ঈমান রয়েছে। সে জানে যে, প্রকৃত উপাস্য তিনিই।

(ইবনু কাসীর)

হালাল ও হারামের বিবরণ

(১) শানে নুযূলঃ- ইসলামের প্রথম অবস্থায় রোযার রাতে একবার নিদ্রিত হবার পর পুনরায় নিদ্রা ভঙ্গ হলে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গম হারাম ছিল। ওমর (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় সাহাবী প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় উক্ত আদেশ পালনে ক্রটি করে ফেলেন। এবং অনুতপ্ত হয়ে নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁদের অনুতাপে আল্লাহ তা'আলা সদয় হয়ে পূর্ব ব্যবস্থা রহিত করে সুবৃহি সাদিক্বের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত কার্যগুলো জায়েয করে দেন। এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ - هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ - عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ - فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ - وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ - ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ - وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ - تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا - كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ *

অর্থঃ- তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে রোযার রাতে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে মিলনে প্রবৃত্ত হওয়া; কেননা, তারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের আবরণ স্বরূপ। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা বিশ্বাস ঘাতকতার পাপে নিজেদের লিপ্ত করতে ছিলে। যা হোক তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের পাপ মোচন করেছেন। সুতরাং এখন তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা এবং যা (অনুমতি প্রদানে) আল্লাহ তা'আলা

তোমাদের জন্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, (অবাধে) এর প্রস্তুতি কর, আর পানাহার কর, যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট সুবৃহে সাদিকের সাদা রেখা পৃথক হয়ে যায় কাল রেখা হতে। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত্রি পর্যন্ত। আর পত্নীদের সঙ্গে স্বীয় শরীরও মিলতে দিও না যখন তোমাদের মসজিদে ই'তিকাফ কারী হও। এগুলো আল্লাহর বিধান, সুতরাং তা লংঘনের কাছে যেও না। তদ্রূপ আল্লাহ স্বীয় বিধান সমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করেন, যেন তারা মুত্তাক্বী হতে পারে। (সূরাঃ বাক্বারা- ১৮৭)

ব্যাখ্যাঃ- বাক্যাংশটি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে এ আয়াত দ্বারা হালাল করা হয়েছে, তা ইতঃপূর্বে হারাম ছিল। বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সাহাবী হযরত বারা ইবনু আ'যিবের বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রথম যখন রামাযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, তখন ইফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু হারাম হয়ে যেতো। কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। আয়স ইবনু-সারমাহ্ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোনখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন ততক্ষণে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানা- পিনা তাঁর জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই রোযা রাখেন। কিন্তু দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। (ইবনু কাসীর)

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সুর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহি-সাদিক্ব উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার পূর্বে কিংবা ঘুম থেকে উঠার পর

সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষরাত্রে সেহরী খাওয়া সুন্নত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে।

---

(২) শানে নুযূলঃ- ইয়াহুদীরা বলত, হে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি উটের গোশত ও দুধ খেয়ে থাকেন আর ইব্‌রাহীম (আঃ) এর ধর্মের উপর আছেন বলে দাবি করেন, অথচ এটা ইবরাহীম (আঃ) এমনকি নূহ (আঃ) এর সময় হতেই হারাম। ইয়াহুদীদের এ দাবী খণ্ডনের জন্য আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآئِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةُ ـ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ *

অর্থঃ- *তাওরাত অবতীর্ণ হবার পূর্বে ইয়াকুব (আঃ) নিজের জন্য যা হারাম করেছিলেন,তা ব্যতীত বাকী সমস্ত খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। আপনি বলে দিন, তবে তাওরাত আনয়ন কর, অতঃপর তা পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।* (সূরা ঃ আল-ইমরান-৯৩)

ব্যাখ্যাঃ- আলোচ্য আয়াতটিতে ইয়াহুদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে । বলা হচ্ছে ঃ তাওরাত অবতরণের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী ইসরাঈলের জন্যেও হালাল ছিল। তবে উটের গোশত বিশেষ কারণ বশতঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজেই নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন । পরে তার বংশধরের জন্যেও তা হারাম ছিল।

বিশেষ কারণটি ছিল এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) 'ইরকুন্নিসা' (সাইটিকা বাত) রোগে আক্রান্ত হয়ে মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ রোগ থেকে মুক্তি দিলে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য বস্তু পরিত্যাগ করবেন। এরপর তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু উটের গোশত পরিত্যাগ করেন। (হাকিম, তিরমিযী, রুহুল মা'আনী)

মানতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল, তা ওহীর নির্দেশে বনী-ইসরাঈলের জন্যে পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, তাদের শরীয়তে মানতের কারণে হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যেতো। আমাদের শরীয়তেও মানতের কারণে জায়েয কাজ ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মানত করে হালালকে হারাম করা যায়না। এরূপ ক্ষেত্রে মানত কসমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব হবে।

ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত, ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একবার কয়েকজন ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগমন করত বলে, 'আমরা আপনাকে এমন কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করছি যেগুলো নবী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আপনি ঐগুলোর উত্তর দিন। তিনি বলেন ঃ 'যা ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস কর, কিন্তু আল্লাহ তা'আলাকে সম্মুখে বিদ্যমান জেনে আমার নিকট ঐ অঙ্গীকার কর, যে অঙ্গীকার হযরত ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পুত্রদের (বানী ইসরাঈলের) নিকট নিয়েছিলেন। তা এই যে, আমি যদি ঐ কথাগুলো তোমাদেরকে ঠিক ঠিক বলে দেই তবে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করত আমার অনুগত হয়ে যাবে।' তারা শপথ করে বলল, 'আমরা একথা মেনে নিলাম। যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করত আপনার অনুগত হয়ে যাবো।'

অতঃপর তারা বলল, 'আমাদেরকে এ চারটি প্রশ্নের উত্তর দিনঃ (১) ইসরাঈল (ইয়াকূব আঃ) নিজের উপর কোন্ খাদ্য হারাম করেছিলেন? (২) পুরুষের বীর্য ও স্ত্রীলোকের বীর্য কিরূপ হয়, কখনো পুত্র ও কখনো কন্যা

হয় কেন? (৩) নিরক্ষর নবীর ঘুম কিরূপ হয়? এবং (৪) ফিরিশতাদের মধ্যে কোন্ ফিরিশতা তাঁর নিকট অহী নিয়ে আসেন?' এরপর তিনি দ্বিতীয়বার তাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উত্তরে বলেন, (১) ইসরাঈল (আঃ)(ইয়াকুব আঃ) কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঐ রোগ হতে আরোগ্য দান করেন তবে তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস পরিত্যাগ করবেন। তারপর তিনি আরোগ্য লাভ করলে উটের গোশ্ত খাওয়া ও দুধ পান পরিত্যাগ করেন। (২) পুরুষের বীর্যের রং সাদা ও গাঢ় এবং নারীর বীর্যের রং হলদে ও তরল হয়। এ দু-এর মধ্যে যা উপরে এসে যায় ওর উপরে সন্তান ছেলে বা মেয়ে হয়ে থাকে এবং আকার ও অনুরূপতাও ওর উপর নির্ভর করেই হয়। (৩) এ নিরক্ষর নবীর ঘুমের সময় চক্ষু ঘুমিয়ে থাকে বটে কিন্তু অন্তর জেগে থাকে এবং (৪) আমার নিকট ঐ ফিরিশতাই অহী নিয়ে আসেন যিনি সমস্ত নবীর নিকট অহী নিয়ে আসতেন। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আঃ)' একথা শুনেই তারা চীৎকার করে বলে উঠে, 'যদি অন্য কোন ফিরিশতা আপনার বন্ধু হতেন তবে আপনার নবুওয়াতকে মেনে নিতে আমাদের কোন আপত্তি থাকতো না।' প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরের সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শপথ করাতেন ও প্রশ্ন করতেন এবং তারা স্বীকার করতো যে উত্তর সঠিক হয়েছে। তাদের ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

*

(৩) শানে নুযূলঃ- শরাব হারাম হবার পূর্বে একদিন আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) এক নিমন্ত্রণে স্বীয় মেহমানদেরকে শরাব পান করিয়েছিলেন। তখন মাগরিবের সময় ছিল। সকলেই নামাযে দাঁড়ালেন, আলী (রাঃ) ইমামতি করছিলেন, নেশার ঘোরে তার মুখ হতে তাওহীদের পরিপন্থী একটি কালাম বের হয়ে পড়ল (অবশ্য এটা অনিচ্ছাকৃত ছিল)। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় এবং এতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكْرٰي حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ـ وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا *

অর্থঃ- *হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটেও যেওনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের মুখের কথাগুলো উপলব্ধি করতে পার। এবং নাপাক অবস্থায় যে পর্যন্ত না গোসল করে লও, তবে তোমাদের মুসাফির অবস্থা ব্যতীত, আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা মুসাফির অবস্থায় থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সঙ্গম করে থাক, তখন যদি তোমরা পানি না পাও তবে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে লও অর্থাৎ স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ্ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় মার্জনাকারী, মহা ক্ষমাপরায়ণ।*
(সূরাঃ নিসা-৪৩)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তা'আলার নিকট মদ পান ও নেশা করা হারাম ছিল। বিশেষতঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা করা ছিল আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেয়া হলে, মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হত। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল এবং এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ককে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হল। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শুধুমাত্র এ হুকুমই দেয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছেও যেওনা। যার মর্ম ছিল এই যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা

মানুষকে নামাযে বাধা দান করে। (কাজেই দেখা গেল) অনেকে তখন থেকেই অর্থাৎ, এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়িদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হল এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অযূ-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র-উম্মাতে মুহাম্মাদীকেই দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ফিকাহ্‌র কিতাব ছাড়াও সাধারণ বাংলা-উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে পারে।

---

(৪) শানে নুযূলঃ- মদ্যপান ও জুয়া হারাম হয়ে গেলে কোন কোন সাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের মধ্যে অনেক লোকই মদ্যপায়ী ছিলেন, জুয়ালব্ধ মালও ভক্ষণ করতেন। এ হারাম মাল পেটে থাকা অবস্থায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন অতঃপর এগুলো হারাম হয়েছে, তাদের কি অবস্থা হবে? সাহাবাদের উক্ত প্রশ্নের জবাবে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ـ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ *

অর্থঃ- *যারা ঈমান রাখে এবং নেক কাজ করে এরূপ লোকদিগের উপর তাতে কোন গুনাই নেই, যা তারা পানাহার করেছে। যখন তারা পরহেয করে এবং ঈমান রাখে ও নেক কাজ করে, পুনঃ পরহেয করতে থাকে এবং ঈমান রাখে, পুনঃ পরহেয করতে থাকে এবং খুব নেক কাজ করতে থাকে; বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এরূপ নেককারদেরকে ভালবাসেন।*
(সূরাঃ মায়িদা-৯৩)

ব্যাখ্যাঃ- ইমাম যুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) একবার জনগণকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা মদ্য পান থেকে বিরত থাক। কেননা, এটাই হচ্ছে সমস্ত দুষ্কার্য ও অশ্লীলতার মূল। তোমাদের পূর্বযুগে একজন বড় 'আবেদ লোক ছিল। সে জনগণের সাহচর্যে থাকতো না। একটি পতিতা মহিলার তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। সে সাক্ষ্য নেয়ার বাহানায় তার চাকরাণীর মাধ্যমে তাকে ডেকে পাঠায়। সে তার সাথে চলে আসে। অতঃপর সে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, পিছন থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশেষে সে মহিলাটির নিকট হাযির হয়ে দেখতে পায় যে, সেখানে একটি শিশু ও মদের একটি কলস রয়েছে। সে তখন তাকে বলে, "আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে সাক্ষ্য নেয়ার উদ্দেশ্যে ডাকিনি। বরং ডেকেছি এই উদ্দেশ্যে যে, আপনি আমার কাছে থেকে রাত কাটাবেন, অথবা এই শিশুটিকে হত্যা করবেন কিংবা মদ পান করবেন।" তখন সে (হত্যা ও ব্যভিচার অপেক্ষা মদ্যপানের পাপকে ছোট মনে করে) এক পেয়ালা মদ পান করে ফেলে। তারপর বলেঃ 'আমাকে আরও দাও।' শেষ পর্যন্ত সে নেশাগ্রস্ত হয়ে শিশুটিকে হত্যা করে বসে এবং মহিলাটির সাথে ব্যভিচার করে ফেলে। তাই তোমরা মদ্যপান থেকে বিরত থাক। মদ ও ঈমান কখনও এক জায়গায় জমা হতে পারে না। মদ থাকলে ঈমান নেই এবং ঈমান থাকলে মদ নেই। তাঁর এ উক্তির প্রমাণ হিসেবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ঐ হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ব্যভিচারী যে সময় ব্যভিচার করে সে সময় সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না এবং মদ্যপানকারী যখন মদ্যপান করে তখন সে মুমিন

থাকে না। মুসনাদ আহমাদে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি- "যে ব্যক্তি মদ্য পান করে, আল্লাহ তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন। ঐ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তবে সে কাফির হয়ে মারা যাবে। আর যদি সে তাওবা করে তবে আল্লাহ সেই তাওবা ক্ববূল করবেন।"

---

(৫) শানে নুযূলঃ- হুদাইবিয়ার বৎসর নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তাঁর ও সঙ্গীয় সাহাবাদের ইহ্‌রামের অবস্থায় পথিমধ্যে দলে দলে শিকারের জন্তু এসে তাঁদের পাশ ঘেঁষে চলত। ইহ্‌রামের অবস্থায় থাকা বশতঃ তাঁরা শিকার করতে পারতেন না। এ সম্বন্ধে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَىْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ـ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

অর্থঃ- *হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যেগুলো পর্যন্ত তোমাদের হাত এবং তোমাদের বল্লম পৌঁছতে পারবে, এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেন, কে তাঁকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এটার পরও সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।* (সূরাঃ মায়িদা- ৯৪)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে- আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, শিকার দুর্বল হোক বা ছোট হোক, তোমরা ইহরামের অবস্থায় শিকার করা থেকে বিরত থাকছো কি-না। এমনকি যদি লোকেরা চায় তবে সেই শিকারকে হাতে ধরে নিতে

পারে, তাই তাদেরকে তার নিকটবর্তী হতেও আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করলেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, تنالہ ایدیکم দ্বারা ছোট ও বাচ্চা শিকারকে বুঝানো হয়েছে। رماحکم দ্বারা বুঝানো হয়েছে বড় শিকার। মুকাতিল ইবনু হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, মুসলমানরা যখন উমরা পালনের উদ্দেশ্যে হুদাইবিয়ায় অবস্থান করছিলেন, সে সময় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সেখানে বন্য চতুষ্পদ জন্তু, পাখী এবং অন্যান্য শিকার তাঁদের অবস্থান স্থলে জমা হয়ে গিয়েছিল। এরূপ দৃশ্য তাঁরা ইতঃপূর্বে দেখেননি। সুতরাং ইহরামের অবস্থায় তাঁদেরকে শিকার করতে নিষেধ করা হয়, যাতে আল্লাহ তা'আলা জানতে পারেন যে, কে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছে এবং কে করছে না।

(ইবনু কাসীর)

হরমের সীমার ভেতরে ইহ্‌রাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম, তা খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম জন্তু হোক সবই হারাম।

* বন্য জন্তুকে শিকার বলা হয়, যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব জন্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত, যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু উট এগুলো যবাই করা এবং খাওয়া জায়িয।

* তবে যেসব জন্তু দলীলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা এবং বদ করা হালাল। যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার।

আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে বলেনঃ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

"তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে।" কিছুসংখ্যক স্থলভাগের জন্তু, যেমন- কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর- প্রভৃতি বধ করা হালাল। এমনিভাবে যে হিংস্র জন্তু নিজে আক্রমণ করে, সেটিকে বধ করাও হালাল। হাদীসে এগুলোর ব্যতিক্রম উল্লিখিত হয়েছে।

* যে হালাল জন্তু ইহরাম ছাড়া অবস্থায় এবং হরমের বাইরে শিকার

করা হয়, ইহ্‌রামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েয। যদি সে জন্তুকে শিকার করা ও বধ করার কাজে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা কিংবা জন্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে তাই বলা হয়েছে।

*

(৬) শানে নুযূলঃ- পারস্য দেশীয় অগ্নিপূজক কাফিরদের সঙ্গে মক্কার কাফিরদের বন্ধুত্ব ছিল। তারা মক্কায় লিখে পাঠাল যে, তোমাদের সেই নিরক্ষর নবীকে জিজ্ঞেস কর, এটা কেমন ধর্ম নিজেদের যবেহকৃত জীব খাচ্ছে, আর আল্লাহ যে জীবকে মারেন তা খায় না"? এ সম্বন্ধে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ .... وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ *

অর্থঃ- *অতএব, যে জীবের উপর (যবা কালে) আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, তা হতে খাও, যদি তোমরা তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি ঈমান রাখ। আর যে জীবের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা হতে না খাওয়ার তোমাদের কি কারণ থাকতে পারে? অথচ, আল্লাহ ঐ সকল জীবের বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন- যে গুলো তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, কিন্তু তাও তোমাদের একান্ত প্রয়োজন হলে হালাল। আর এটা সুনিশ্চিত যে, অনেকে স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী বিভ্রান্ত করতে থাকে প্রমাণ ব্যতিরেকে; এতে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে খুব জানেন; আর তোমরা প্রকাশ্যও অপ্রকাশ্য পাপ বর্জন কর; নিঃসন্দেহে যারা গুনাহ করছে, তারা স্বীয় কৃত কর্মের শাস্তি সত্বরই প্রাপ্ত হবে। আর এমন জীব হতে ভক্ষণ করোনা যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি। এবং নিঃসন্দেহে এটা গুনাহের কাজ; আর নিশ্চয় শয়তানরা স্বীয় বন্ধুদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, যেন তারা তোমাদের সঙ্গে (অযথা) বিতর্ক করে, আর যদি তোমরা তাদের অনুসরণ করতে থাক, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।* (সূরাঃ আনআম- ১১৮- ১২১)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে অনুমতি দিচ্ছেন যে, কোন জীবকে যবাই করার সময় "বিসমিল্লাহ" বলা হলে তারা সেই জীবের গোশত খেতে পারে। অর্থাৎ যে জন্তুকে আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাই করা হয় তা হারাম। যেমন কাফির কুরাইশরা মৃত জন্তুকে ভক্ষণ করতো এবং যে জন্তুগুলোকে মূর্তি ইত্যাদির নামে যবাই করা হতো সেগুলোকেও খেতো। মহান আল্লাহ বলেন, যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবে না কেন? তিনি তো হারাম জিনিসগুলো তোমাদের জন্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মতবাদের উল্লেখ করে বলেনঃ তারা কিভাবে নিজেদের জন্যে এবং গাইরুল্লাহর নামে যবাইকৃত জন্তুকে হালাল করে নিয়েছে! তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতার কারণে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পিছনে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ ঐ সব সীমা অতিক্রমকারী সম্পর্কে ভালরূপেই অবগত আছেন (ইবনু কাসীর

এ বাক্যে ইচ্ছাধীন যবেহ ও নিরুপায় অবস্থার যবেহ্- উভয় প্রকার যবেহকেই বোঝানো হয়েছে। নিরুপায় অবস্থার যবেহ হচ্ছে তীর, বাজপক্ষী ও কুকুরের শিকার করা জন্তু। এগুলো ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করলে এদের শিকার করা জন্তু জীবিত না পাওয়া গেলেও তাকে যবেহ করা জন্তু বলেই মনে করতে হবে। অবশ্য জীবিত পাওয়া গেলে ইচ্ছাধীনভাবে যবেহ্ করতে হবে।

*

(৭) শানে নুযূল ঃ- আউফ ইবনু মালিক (রাঃ) রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে এসে বলল," আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা হারাম করেছেন, আপনিও কি তাই হারাম করেছেন? নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পূর্ব-পুরুষেরা হারাম করলে হারাম হয়

না। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۔ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۔ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِيْنٌ *

অর্থঃ- *আর চতুষ্পদগুলোর মধ্যে উচ্চাকৃতি ও খর্বাকৃতির; যা কিছু আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন, তা ভক্ষণ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।*

(সূরাঃ আনআম- ১৪২)

ব্যাখ্যাঃ- অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে ফল-ফলাদি, ফসল, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি প্রদান করেছেন সেগুলো তোমরা খাও, এগুলো আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবিকা বানিয়েছেন। তোমরা শয়তানের অনুসরণ করো না। যেমন এই মুশরিকরা তার অনুসরণ করছে। তারা কোন কোন আহার্যকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছে। হে লোক সকল! শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অর্থাৎ তোমরা একটু চিন্তা করলেই তার শত্রুতা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সুতরাং তোমরাও শয়তানকে নিজেদের শত্রু বানিয়ে নাও।

(৮) শানে নুযূলঃ- খাওলার স্বামী খাওলাকে বলেছিল "তুমি আমার নিকট মায়ের পিঠতুল্য।" মূর্খতার যুগে কেউ স্ত্রীকে এরূপ বললে স্ত্রীকে চিরতরে হারাম মনে করা হত। খাওলাহ নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মনে হয় তুমি স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ। খাওলাহ বলল, 'আমার সন্তানের উপায় কি হবে ? আমার স্বামী তো তালাক শব্দ বলেনি।"

অতঃপর খাওলাহ আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলে, নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ
اِلَى اللّٰهِ ۔ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ
.... عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

অর্থঃ- *নিশ্চয় আল্লাহ ঐ স্ত্রীলোকটির কথা শুনেছেন, যে স্বীয় স্বামীর ব্যাপারে আপনার নিকট বাদানুবাদ করছিল এবং আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করছিল, আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলেন। আল্লাহ সব শুনেন, সব দেখেন। তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি "যিহার" করে (স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে "যিহার" বলা হয়) তারা তাদের মাতা নয়: তাদের মাতা তো কেবল তারাই, যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। আর নিঃসন্দেহে তারা একটি অসঙ্গত ও মিথ্যা উক্তি করছে, আর নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী। আর যারা নিজ নিজ স্ত্রীদের প্রতি যিহার করে, অতঃপর নিজেদের উক্ত কথার সংশোধন করতে চায়, তবে তাদের কর্তব্য যে, একটি দাস অথবা দাসী আযাদ করে, তারা উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই, এটা দ্বারা তোমাদের কে নসীহত করা হচ্ছে, আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন। অনন্তর যার সামর্থ না থাকে, তার যিম্মায় উভয়ের পরস্পর মিলনের পূর্বে ধারাবাহিক দু,মাস রোযা রাখা, অনন্তর যে এটাও না পারে, তবে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে; এ নির্দেশ এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর: এটা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমাসমূহ; আর কাফিরদের জন্য কঠোর যন্ত্রণাময় আযাব রয়েছে।*

(সূরা ঃ মুজাদালাহ-১-৪)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ্ তাআলা খাওলার (রাঃ) ফরিয়াদ শুনে তার জন্যে

তার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন । তার খাতিরে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এসব আয়াত নাযিল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা ওমর (রাঃ) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পথিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বললঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন। খলীফা বললেনঃ জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ তাআলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব, আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহর কসম, তিনি যদি স্বেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম। (ইবনু কাসীর)

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লিখিত নারী হলেন হযরত আওস ইবনু সামিত (রাঃ)-এর স্ত্রী খাওলাহ বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে যিহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত নাযিল করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে কেবল যিহারের শরীয়ত সম্মত বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেননি; বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে শুরুতেই বলে দিলেনঃ যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জওয়াব দেয়া সত্ত্বেও মহিলা বার বার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই "مجادلة" বলা হয়েছে। কতক রিওয়াতে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াবে খাওলাকে বললেনঃ তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোন বিধান নাযিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত হলঃ আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাযিল হয়। আমার ব্যাপারে কি হল যে, ওয়াহীও বন্ধ হয়ে গেল। (কুরতুবী)

এরপর খাওলা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়।

আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়ায ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন; খাওলাহ বিনতে সা'লাবা যখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ্ তাআলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন ....قد سمع (বুখারী, ইবনু কাসীর)

কয়েকটি চুরির ঘটনা

(১) শানে নুযূলঃ- জনৈক মুসলমান রাত্রি কালে আরেক মুসলমানের ঘরে ঢুকে এক বস্তা আটা ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে প্রথমে এক বাড়ীতে নিল, অতঃপর সেখানে আরেক ইয়াহুদী বন্ধুর ঘরে নিয়ে আমানত রাখল। ঘটনাক্রমে বস্তাটি ছিদ্র যুক্ত থাকায় পথে পথে আটা পড়ে চিহ্ন থেকে গেল। মালিক প্রাতঃকালে চিহ্ন ধরে চোরের বাড়ী উপস্থিত হয়ে মালের দাবী করল। সে কসম করে অস্বীকার করল। মালিক পুনঃ চিহ্ন ধরে ইয়াহুদীর বাড়ী গিয়ে মালের দাবী করল। ইয়াহুদী বলল, উমুক ব্যক্তি গতরাতে আমার বাড়ীতে এগুলো আমানত রেখে গেছে। প্রতিবেশীরা ইয়াহুদীর পক্ষে সাক্ষ্যও দিল। অবশেষে বিচার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে পেশ হল। চোর ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা কসম করে ইয়াহুদীকে চোর প্রমাণিত করল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও ধারণা করেছিলেন যে, মুসলমান মিথ্যা কসম করে না। সুতরাং তিনিও ইয়াহুদীকে চোর সাব্যস্ত করে তার প্রতি রাগ করছিলেন। এমন সময় নিম্নের আয়াতগুলো নাযিল হয়।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ـ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا

.... اِثْمًا مُّبِيْنًا *

অর্থঃ- *নিশ্চয় আমি আপনার নিকট সত্যসহ এ কিতাব প্রেরণ করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যে তদানুযায়ী মীমাংসা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে (ওহী দ্বারা)জানিয়ে দিয়েছেন; আর আপনি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাতমূলক কথা বলবেন না। আপনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আপনি তাদের পক্ষ হতে জওয়াবদেহীর কোন কথা বলবেন না, যারা নিজেদেরই অনিষ্ট করছে; নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে অতি বড় বিশ্বাস ঘাতক, মহাপাপী। যাদের অবস্থা এরূপ যে, মানুষ হতে তো গোপন করেই এবং আল্লাহকেও লজ্জা করে না। অথচ আল্লাহ ঐ সময়েও তাদের নিকটে থাকেন যখন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিরুদ্ধ কথা বার্তা সম্বন্ধে অভিসন্ধি করতে থাকে; এবং আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমূহকে স্বীয় বেষ্টনীতে রেখেছেন। হাঁ, তোমরা এরূপ যে, পার্থিব জীবনে তো তোমরা তাদের পক্ষ হতে জওয়াবদিহীর কথা বললে, কিন্তু ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহর সম্মুখে তাদের পক্ষ হয়ে কে জওয়াবদিহী করবে? কিংবা সে ব্যক্তি কে- যে তাদের কার্য নির্বাহক হবে? আর যে ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম করে, অথবা নিজ আত্মার ক্ষতি সাধন করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কার্য করে, সে শুধু স্বীয় আত্মার উপরই এটার প্রতিক্রিয়া পৌছায়; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় আর যে ব্যক্তি কোন ছোট কিংবা বড় পাপ করে, অতঃপর এটার অপবাদ কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, তবে তো সে নিজের উপর চাপিয়ে নিল জঘন্যতম অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপ।*

(সূরা ঃ নিসা- ১০৫- ১১২)

ব্যাখ্যাঃ- ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ

মুসলমানরা দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন। তাঁদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের আটা। এগুলো খুব দুর্লভ ছিল এবং মদীনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ কেউ মেহমানদের জন্যে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত। রিফাআ'হ্ এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যেই কিছু অস্ত্রশস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তো'মা রাতে সিঁদ কেটে বস্তা বের করে নেয়। সকালে হযরত রিফাআ'হ্ ব্যাপার দেখে তার ভাতিজা কাতাদার কাছে ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোঁজাখুজি শুরু করলেন। কেউ কেউ বলল, আজ রাত্রে আমরা বনী উবাইরাকের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেছি। মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য ফাঁস হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী-উবাইরাক নিজেরাই এসে হাজির হল এবং বলল এটা লাবীদ ইবনু সাহলের কাজ। আমরা তো তাকে খাঁটি মুসলমান বলেই জানতাম। খবর পেয়ে লাবীদ তরবারী কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা আমাকে চোর বলছ? নাও, চুরির রহস্য উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না।

বনী উবাইরাক আস্তে বলল ঃ আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনার নাম কেউ নেয় না। আপনার দ্বারা এ কাজ হতেও পারে না। বগভী ও ইবনু জরীরের রিওয়ায়াতে এস্থলে বলা হয়েছে যে, বনী- উবাইরাক জনৈক ইয়াহুদীর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। ধূর্ততাবশতঃ তারা আটার বস্তা সামান্য ছিড়ে ফেলেছিল। ফলে রিফাআ'হ্র গৃহ থেকে উপরিউক্ত ইয়াহুদীর গৃহ পর্যন্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এবং লৌহ বর্মও ইয়াহুদীর কাছাকাছি রেখে দিল। তদন্তের সময় তার গৃহ থেকেই এগুলো বের হল। ইয়াহুদী কসম খেয়ে বলল, ইবনু উবাইরাক আমাকে লৌহ- বর্মটি দিয়েছে।

তিরমিযীর রিওয়ায়াত ও বগভীর রিওয়ায়াতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বনী-উবাইরাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে টিকবে না,

তখন ইয়াহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যাহোক, এখন বিষয়টি বনী-উবাইরাক ও ইয়াহুদীর মধ্যে গিয়ে গড়ায়।

এদিকে বিভিন্ন পন্থায় কাতাদা ও রিফাআ'হর প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি বনী-উবাইরাকেরই কীর্তি। কাতাদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনী উবাইরাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী-উবাইরাক সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে রিফাআ'হ্ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরী'অত সম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। অথচ চোরাই মাল ইয়াহুদীর ঘর থেকে বের হয়েছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুণ, তারা যেন আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এরও প্রবল ধারণা জন্মে যে, এ কাজটি ইয়াহুদীর। বনূ-উবাইরাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয়। বগভীর রিওয়ায়াতে আছে, এমন কি, তিনি ইয়াহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন।

এদিকে কাতাদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করছেন। এতে হযরত কাতাদা খুব দুঃখিত হলেন এবং আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কোন কিছু না বলাই ভাল ছিল। এমনি ভাবে হযরত রিফাআ'হ্কেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রিফাআহ্ও ধৈর্য ধারণ করলেন এবং বললেনঃ (আল্লাহ সহায়)।

বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের পূর্ণ একটি রুকু অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে ঘটনার বাস্তবরূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়।

কুরআন মাজীদ বনী উবাইরাকের চুরি ফাঁস করে ইয়াহুদীকে দোষমুক্ত করে দিল। এতে বনী উবাইরাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি রিফাআ'হ্কে তা প্রত্যার্পণ করলেন। রিফাআ'হ্ সমূদয় অস্ত্রশস্ত্র জিহাদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন। এদিকে বনী উবাইরাকের চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে বশীর-ইবনু উবাইরাক মদীনা থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার কাফিরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুনাফিক থাকলে এবার প্রকাশ্যে কাফির এবং পূর্বে মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল।

তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচারণের পাপ বশীরকে মক্কায়ও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল, সে ঘটনা জানতে পেয়ে তাকে বহিষ্কার করে দিল।

এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁধ কাটে এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অষ্টম (অর্থাৎ, ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে কোন অপরাধ করে তা অন্য নিরপরাধ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, (যেমন বর্ণিত ঘটনায় বনী-উবাইরাক নিজে চুরি করে হযরত লবীদ অথবা ইয়াহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল) সে জঘন্য অপরাধ এবং প্রকাশ্য গুনাহর বোঝা বহন করে।

নবম (অর্থাৎ,১১৩) আয়াতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গ না হলে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত। তিনি ওয়াহীর মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা বলে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী। তাই কখনও তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না; বরং নিজেরাই পথভ্রষ্ট হবে। আপনার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি

অবতীর্ণ করেছেন, যা আপনি ইতঃপূর্বে জানতেন না।

---

(২) শানে নুযূলঃ- হাতাম কান্দী নামক জনৈক মূর্খ কাফির একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল, আপনি মানুষকে কিসের দিকে ডাকছেন? তিনি বললেন, তাওহীদ, রিসালাত, নামায-রোযা ও যাকাতের প্রতি। সে বলল, বিষয়গুলো তো ভালই, তবে ক্বওমের নেতৃবৃন্দের পরামর্শ ছাড়া আমি কিছুই করিনা। তারা পরামর্শ দিলে আপনার ধর্ম গ্রহণ করব। অতঃপর সে যাবার সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি শয়তানের মুখে কথা বলেছে। কাফির অবস্থায় এসেছে, মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ অবস্থায় গিয়েছে। যাবার পথে সদক্বার উট নিয়ে পালাল। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ওমরাহ পালনের জন্য যাত্রা করলেন, সঙ্গী সাহাবাগণ দেখতে পেলেন হাতাম কান্দী সে উটগুলোর গলায় পাট্টা পরিয়ে কাবা অভিমুখে নিয়ে যাচ্ছে। সাহাবাগণ তা কেড়ে নিতে চাইলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا - وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا - وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا - وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى - وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ *

অর্থঃ- *হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর প্রতীকসমূহের অসম্মান করোনা এবং সম্মানিত মাস সমূহেরও না এবং হারাম শরীফে কুরবানী করার জন্য নির্দিষ্ট জীবেরও না এবং ঐ সমস্ত জীবেরও না যাদের গলায় দোয়াল বা পাট্টা পরান হয়েছে এবং ঐ সমস্ত লোকেরও না-যারা বাইতুল হারামের উদ্দেশ্যে গমন করছে-স্বীয় প্রভুর করুনা ও সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী হয়ে, আর যখন তোমরা ইহ্‌রাম ত্যাগ কর, তখন শিকার কর; আর যেন তোমাদের জন্য সীমা লঙ্ঘনের কারণ না হয়ে পড়ে ঐ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম(-এ প্রবেশ করা) হতে প্রতিরোধ করার দরুণ হয়েছে। এবং নেকী ও পরহেযগারীতে একে অন্যের সাহায্য করতে থাক, পাপকার্যেও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য কারো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শাস্তি প্রদানে কঠোর।*

(সূরাঃ মায়িদা-২)

ব্যাখ্যাঃ- হরমে কুরবানী করার জন্তু বিশেষতঃ যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ কণ্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হরম পর্যন্ত পৌঁছতে না দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় এই যে, এগুলোকে কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। যেমন, আরোহণ করা অথবা দুগ্ধ লাভ করা ইত্যাদি। আয়াতটি এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে।

এছাড়া ঐসব লোকেরও অবমাননা করোনা, যারা হজ্বের জন্যে পবিত্র মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার কৃপা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না।

তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে প্রমাণিত, ইকরামা ও ইবনু জারীর প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন যে, এ আয়াতটি হাতিম ইবনু হিন্দ আল বাক্রীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। একদা সে মদীনার একটি চারণ ভূমি লুণ্ঠন

করে এবং পরবর্তী বছর সে বাইতুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এ সময় কোন কোন সাহাবী পথিমধ্যে তাকে বাধা দেয়ার মনস্থ করলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। ইবনু জারীর আলিমদের ইজমার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কোন মুশরিক ব্যক্তিকে যদি কোন মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা প্রদান করা হয় তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে যদিও সে বাইতুল্লাহ বা বাইতুল মাকদিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কেননা, উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ মুশরিকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নাঁফরমানী, শির্ক ও কুফরী করার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের দিকে রওয়ানা হয় তাকেও বাধা দেয়া বৈধ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র অতএব তারা যেন এ বছরের পর আর কখনও কা'বা গৃহের নিকটবর্তী না হয়।" (ইবনু কাসীর)

---

(৩) শানে নুযূলঃ- ষষ্ঠ হিজরীতে ওরাইনা কবিলার কতিপয় লোক এসে ইসলাম গ্রহণ পূর্বক মীনায় বাস করছিল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া সহ্য না হওয়ায় তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজস্ব পনেরটি উট শহরের বাইরে এক বাগানে গোলাম ইয়াসার (রাঃ) রক্ষণাধীনে ছিল। এদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যেন উটের দুগ্ধ ও মূত্র খেয়ে রোগমুক্ত হয়। এরা কিছু দিনের মধ্যে রোগমুক্ত হয়ে উটগুলো নিয়ে পলায়ন করতে আরম্ভ করল। ইয়াসার (রাঃ) পশ্চাদ্ধাবন করলে তারা তাকে ধরে হাত-পা কেটে এবং চক্ষু ও জিহ্বায় কাঁটা বিঁধিয়ে শহীদ করল। সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু জাবিরের নেতৃত্বে বিশজন অশ্বারোহী পাঠালেন। তারা তাদের ধরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাযির করলেন, এ ডাকাতদের শাস্তি বিধানের জন্যই নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

اِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ

وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ - ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ *

অর্থঃ- *যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে সংগ্রাম করে, আর (এ সংগ্রামের অর্থ এই যে,) ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা শুলে চড়ান হবে, কিংবা তাদের এক দিকের হাত এবং অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠের উপর (স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা) হতে বের করে (কারাগারে পাঠিয়ে) দেয়া হবে; এটা ইহলোকে তাদের জন্য ভীষণ অপমান; আর পরকালেও তাদের ভীষণ শাস্তি হবে।* (সূরা ঃ মায়িদা-৩৩)

ব্যাখ্যাঃ- দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদূদের বেলায় কোন সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না। শরীয়তে হুদূদ মাত্র পাঁচটি ঃ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ- এ চারটির শাস্তি কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহবায়ে- কিরামের ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদুদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখিরাতের গুনাহ্ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তার মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটু ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী

তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উক্কাল গোত্রের কতগুলো লোক আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগমন করে এবং তাঁর কাছে ইসলামের বাইআত গ্রহণ করে। অতঃপর মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয় এবং তাদের পেট মোটা হয়ে যায়। তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে এর অভিযোগ পেশ করে। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা চাইলে আমাদের রাখালের সাথে চলে যাও, সেখানে উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করবে।" তারা বললোঃ "হ্যাঁ (আমরা যেতে চাই।)" সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়লো। অতঃপর তাদের রোগ সেরে গেলো। তখন তারা রাখালকে মেরে ফেললো এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। অতএব তাদেরকে পাকড়াও করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সামনে পেশ করা হয়। তখন তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হয় এবং চোখে গরম শলাকা ভরে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে রৌদ্রে ফেলে রাখা হয় ফলে তারা ধড়ফড় করে মৃত্যুবরণ করে। সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, ঐ লোকগুলো উক্কাল গোত্রের ছিল কিংবা উরাইনা গোত্রের ছিল। তারা পানি চেয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। তারা চুরিও করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরীও করেছিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং তারা রাখালের চোখে গরম শলাকাও ভরে দিয়েছিল।

সে সময় মদীনার আবহাওয়া ভাল ছিল না। তারা "বারসাম' নামক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পিছনে ২০ জন ঘোড় সওয়ার আনসারীকে পাঠিয়েছিলেন। একজন পদব্রজে চলছিলেন, যিনি পদচিহ্ন দেখে দেখে পথ দেখিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুর

সময় তারা পিপাসায় এতো কাতর হয়ে পড়েছিলো যে, মাটি চাটতে শুরু করেছিলো। তাদের ব্যাপারেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। একদা হাজ্জাজ হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে সবচেয়ে বড় ও কঠিন যে শাস্তি দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করুন।" তখন আনাস (রাঃ) এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

অনর্থক প্রশ্ন ও তার উত্তর

(১) *শানে নুযূলঃ-* কুরাইশগণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এসে বলল, আপনি সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করে দিন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। তদুত্তরে আল্লাহ নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন।

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْأَلْبَابِ *

অর্থঃ- নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবানিশির গমনাগমনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

(সূরাঃ আল-ইমরান-১৯০)

ব্যাখ্যাঃ- তাবরানীর মধ্যে রয়েছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কুরাইশরা ইয়াহুদীদের নিকট গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, 'মূসা (আঃ) তোমাদের নিকট কি কি মুজিযা নিয়ে এসেছিলেন?' তারা বলেন, সর্পে পরিণত হয়ে যাওয়া লাঠি এবং দীপ্তিময় হস্ত। অতঃপর তারা খ্রীষ্টানদের নিকট গমন করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, 'ঈসা (আঃ) তোমাদের নিকট কি কি নির্দশন এনেছিলেন? তারা উত্তরে বলে, 'জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, শ্বেত কুষ্ঠরোগীকে ভাল করে দেয়া এবং মৃতকে জীবিত করা।' তখন

কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য 'সাফা' পাহাড়কে সোনা করে দেন।' রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন প্রার্থনা করেন। সে সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী দেখতে চায় তাদের জন্যে এগুলোর মধ্যেই বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। তারা এগুলোর মধ্যে চিন্তা গবেষণা করলেই সেই ক্ষমতাবান আল্লাহর সামনে তাদের মস্তক নুয়ে পড়বে।

আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর নিকট 'আতা (রঃ), ইবনু উমার (রাঃ) এবং উবায়িদ ইবনু উমায়ির (রাঃ) আগমন করেন। তাঁর ও তাঁদের মধ্যে পর্দা ছিল। আয়িশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'উবায়িদ! তুমি আসনা কেন?' উবায়িদ (রাঃ) উত্তরে বলেন, 'আম্মাজান! শুধুমাত্র কোন একজন কবির কথা زرغبا تزدد حبا অর্থাৎ 'সাক্ষাৎ কম কর তাহলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে' এ উক্তির কারণে। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আম্মাজান! আপনার নিকট আমাদের আগমনের কারণ এই যে, আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, 'রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কোন কাজটি আপনার নিকট বেশী বিস্ময়কর মনে হয়েছিল?' আয়িশা (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, 'তাঁর সমস্ত কাজই অদ্ভুত ছিল। আচ্ছা, একটি ঘটনা শুন। একদা রাতে আমার পালায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার সঙ্গে শয়ন করেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেনঃ 'হে আয়িশা! আমি আমার প্রভুর কিছু ইবাদত করতে চাই। সুতরাং আমাকে যেতে দাও'। আমি বলি, 'হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নৈকট্য কামনা করি; এও কামনা করি যে, আপনি যেন মহা সম্মানিত আল্লাহর ইবাদত করেন।, তিনি উঠে পড়েন এবং একটি মশক হতে পানি নিয়ে অযূ করেন। এরপর নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে যান। তারপরে তিনি কাঁদতে আরম্ভ

করেন এবং এত কাঁদেন যে, তাঁর দাড়ি সিক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সিজদায় পড়ে যান এবং এত ক্রন্দন করেন যে, মাটি ভিজে যায়। অতঃপর তিনি কাত হয়ে শুয়ে পড়েন এবং কাঁদতেই থাকেন। অবশেষে বিলাল (রাঃ) এসে নামাযের জন্যে আহ্বান করেন এবং তাঁর নয়নে অশ্রু দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর সত্য রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তা'আলা তো আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত পাপ মার্জনা করে দিয়েছেন।' তিনি বলেনঃ 'হে বিলাল! আমি কাঁদবো না কেন? আজ রাত্রে আমার উপর

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ............ এ আয়াতটি অবতীর্ণ

হয়েছে।' অতঃপর তিনি বলেনঃ 'ঐ ব্যক্তির বড়ই দুর্ভাগ্য যে এটা পাঠ করে অথচ ঐ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করে না।' আবদ ইবনু হুমায়িদ (রঃ) -এর তাফসীরেও এ হাদীসটি রয়েছে। ওতে এও রয়েছে- 'আমরা যখন হযরত আয়িশা (রাঃ) -এর নিকট গমন করি তখন আমরা তাঁকে সালাম জানাই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কে?' আমরা,আমাদের নাম বলি। শেষে এও রয়েছে -নামাযের পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান কাতে গণ্ডদেশের নীচে হাত রেখে শয়ন করেন এবং কাঁদতে থাকেন, এমনকি অশ্রুতে মাটি ভিজে যায়। বিলাল (রাঃ) -এর কথার উত্তরে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে عذاب النار পর্যন্ত তিনি পাঠ করেন।

---

(২) শানে নুযূলঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অপ্রয়োজনীয় খুঁটি নাটি প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, পূর্বকালের লোকেরাও তাদের নবীগণকে এরূপ খুঁটিনাটি প্রশ্ন করত এবং নিজেদের দায়িত্ব বাড়িয়ে নিত; কিন্তু তা পালন করত না। অতএব, শুনামাত্র আমার আদেশ পালন করবে, আর নিষেধ থেকে নিবৃত থাকবে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ - وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَلَكُمْ - عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا - وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ *

অর্থঃ- *হে ঈমানদারগণ! এমন সব বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করোনা, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয়, তবে তোমাদের বিরক্তির কারণ হবে। আর যদি তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয় সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তবে তোমাদের জন্য তা প্রকাশ করে দেয়া হবে। অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল। (সূরাঃ মায়িদা-১০১)*

ব্যাখ্যাঃ- আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, (একদা) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বের হন। সে সময় ক্রোধে তাঁর চেহারা মোবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। ঐ অবস্থায় তিনি মিম্বরে উপবেশন করেন। একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন-আমার (মৃত) পিতা কোথায় আছে? তিনি উত্তরে বলেনঃ "জাহান্নামে।" আর একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে- আমার পিতা কে? তিনি বলেনঃ "তোমার পিতা হচ্ছে আবূ হুযাফাহ্।" তখন উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ "আমরা এতেই সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের ধর্ম, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নবী এবং কুরআন আমাদের কাছে বিদ্যমান। হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সবেমাত্র আমরা অজ্ঞতা ও শির্কের যুগ অতিক্রম করেছি। আমাদের মৃত বাপ-দাদারা কোথায় আছে তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।" এরপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং সে সময় -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সহীহ বুখারী থেকে প্রমাণিত, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনগণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে (মাঝে মাঝে) কৌতুক করেও এসব কথা জিজ্ঞেস করতো। কেউ বলতোঃ "আমার পিতা কে?" আবার কেউ বলতোঃ "আমার হারানো উটনিটি কোথায় আছে?" তখন তাদেরকে এসব প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম আহমাদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বলেনঃ "তোমাদের কেউ যেন কারও কোন কথা আমার নিকট না পৌঁছায়। কারণ আমি তোমাদের সামনে সরলমনা রূপে বের হওয়া পছন্দ করি (অর্থাৎ তোমাদের কোন দোষ আমার কাছে ধরা না পড়ুক এটাই আমি ভালবাসি।)"

আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাঁটাঘাঁটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেয়া হয়নি সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হবার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

মুসলিমের রিওয়ায়াত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নযুল এই যে, যখন হজ্ব ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ অবর্তীর্ণ হয়, তখন আ'করা ইবনু হারিস (রাঃ) প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রসুলাল্লাহ্ আমাদের জন্যে কি প্রতি বছরই হজ্ব করা ফরয? রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেনঃ যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হাঁ, প্রতি বছরই হজ্ব ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেনঃ যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেই না, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দিও-ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশি প্রশ্ন করেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ ও রসূল যেসব বিষয় ফরয করেননি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দেই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজে নিষেধ করি তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ যেসব বিষয়ে আমি নীরব থাকি সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না।

---

(৩) শানে নুযূলঃ- কাফিররা বললো, পয়গম্বর ফিরিশতা কেন হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

وَقَالُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ـ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ *

অর্থঃ- *আর এরা এরূপও বলে যে, তাঁর নিকট কোন ফিরিশ্তা কেন প্রেরণ করা হয়নি? আর যদি আমি কোন ফিরিশ্তা প্রেরণ করতাম, তবে সমস্ত বিষয়েরই সমাপ্তি ঘটত, অতঃপর তাদেরকে একটুও অবকাশ দেয়া হত না।* (সুরাঃ আন'আম−৮)

ব্যাখ্যাঃ- আমি যদি তাদের চাহিদা মত মু'জিযা দেখানোর জন্য ফিরিশতা পাঠিয়ে দেই তবে মু'জিযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মু'জিযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল।

এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এরা ফিরিশতা অবতরণের দাবী করে অদ্ভুত বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। কেননা, ফিরিশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফিরিশতা সামনে আসে, যেমন জিবরাঈল (আঃ) বহুবার মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসেছেন, তবে তারা তাঁকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে।

এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেয়ার পর পঞ্চম আয়াতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছেঃ স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গম্বরকে এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতি ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সাহস হারায়নি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করত।

---

(৪) শানে নুযূলঃ একদিন আবূ জাহাল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আমরা অবশ্য আপনাকে অবিশ্বাস করিনা, কিন্তু আপনি যে ধর্ম ও কিতাব এনেছেন তা আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ *

অর্থঃ- *আমি অবশ্যই জানি যে, তাদের উক্তিসমূহ আপনাকে ব্যথিত করে, বস্তুতঃ এরা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলছেনা বরং এ যালিমরা তো আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করছে।* (সূরাঃ আন'আম−৩৩)

ব্যাখ্যাঃ- আবূ জাহালের কাহিনীর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, সে রাতের বেলা গোপনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিরাত শোনার জন্যে আগমন করে। অনুরূপভাবে আবূ সুফইয়ান ও

আখনাস ইবনুল শুরাইকও আসে। কিন্তু তারা একে অপরের খবর জানতো না। তিনজনই সকাল পর্যন্ত কুরআন শুনতে থাকে। সকালের আলো প্রকাশিত হয়ে উঠলে তারা বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পথে তিনজনেরই সাক্ষাৎ ঘটে। তারা তখন একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেঃ 'কি উদ্দেশ্যে এসেছিলে? তারা প্রত্যেকেই তাদের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা বলে দেয়। অতঃপর তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর তারা এ কাজে আসবে না। কেননা, হতে পারে যে, তাদের দেখাদেখি কুরাইশদের যুবকরাও আসতে শুরু করে দেবে এবং তারা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাবে। দ্বিতীয় রাতে প্রত্যেকেই ধারণা করে যে, ওরা দু'জন তো আসবে না। সুতরাং কুরআন কারীম শুনতে যাওয়া যাক। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সবাই এসে যায় এবং ফিরার পথে পুনরায় পথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে একে অপরকে তিরস্কার করে এবং পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার করে। তৃতীয় রাতেও তারা তিনজনই এসে যায় এবং সকালে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। এবার তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর কখনও কুরআন শুনতে আসবে না।

এক্ষণে আখনাস ইবনু শুরাইক আবূ সুফইয়ান ইবনু হারবের কাছে গমন করে এবং বলেঃ 'হে আবূ হানযালা! তুমি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে যে কুরআন শুনেছো সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি?' উত্তরে আবূ সুফইয়ান বললেনঃ 'হে আবূ সা'লাবা! আল্লাহর কসম! আমি এমন কিছু শুনেছি যা আমার নিকট খুবই পরিচিত এবং ওর ভাবার্থও আমি ভালভাবে বুঝেছি। আবার এমন কিছুও শুনেছি যা আমি জানিও না এবং ওর ভাবার্থও বুঝতে পারিনি।" তখন আখনাস বললোঃ 'আল্লাহর কসম! আমার অবস্থাও তাই।' এরপর আখনাস সেখান থেকে ফিরে এসে আবূ জাহালের নিকট গমন করে এবং তাকে বলে, হে আবুল হাকাম! মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে যা কিছু শুনেছো সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তখন আবূ জাহাল বলল, "গৌরব লাভের ব্যাপারে আমরা আবদে মানাফের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। তারা

দা'ওয়াত করলে আমরাও দা'ওয়াত করি। তারা দান খয়রাত করলে আমরাও করি। অবশেষে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি এমন সময় তারা দাবী করেছে যে, তাদের কাছে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রয়েছেন এবং তাঁর কাছে আকাশ থেকে ওয়াহী আসে, আমরা তো এ কথা বলতে পারছি না এবং তাঁর নবুওয়াতের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করবো না।" আখনাস এ কথা শুনে সেখান থেকে চলে যায়।

(ইবনু কাসীর)

আজকাল যেমন অনেক কাফির ইসলামী সত্যসমূহে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা বশতঃ ইসলামকে অস্বীকার করে চলছে। এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কুরআন মাজীদ বর্তমান জীবনে কোন কোন কাফির সম্পর্কে বলে ঃ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

অর্থাৎ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করছে কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে আছে।

তাওহীদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ

(১) শানে নুযূলঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর প্রতিটি স্থান হতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই তাঁর সন্তানগণ বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন স্বভাবের

ও বিভিন্ন বর্ণের হয়েছে। কাফিররা পুনরুত্থানের কথা শুনে বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, আমাদের হাড়সমূহ মাটি হয়ে যাবার পর আমরা কেমন করে পুনরায় সৃষ্ট হব? তাদের মত পরিবর্তন ও বিশ্বাস জন্মাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا - وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ *

অর্থঃ- *তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, অতঃপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (মৃত্যুর জন্য) এক সময়; এবং আরো একটি নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ পুনরুত্থান হবার সময়) বিশেষ করে আল্লাহরই নিকট রয়েছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর?* (সূরাঃ আনআম-২)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তা'আলাই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আঃ)-কে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সারা পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র-স্বভাবের হয়ে থাকে। (মাযহারী)

এ হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দু'টি মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সমষ্টিগত পরিণতি যাকে কিয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি বুঝাবার জন্যে বলা হয়েছেঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا অর্থাৎ, মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা'আলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্যে একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহ্র ফিরিশতারা জানেন, বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা, সর্বদা, সর্বত্র আশ-পাশে আদম-সন্তানতেদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ, কিয়ামতের উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ অর্থাৎ, আর একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফিরিশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ, গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ, মানুষ যে আল্লাহ্র সৃষ্টজীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্যে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে। বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু, অর্থাৎ কিয়ামতকে প্রমাণ করা একটা মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাভাবিক বিষয়। তাই কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে –অর্থাৎ, এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর ; এটা অনুচিত।

---

(২) শানে নুযূলঃ- আস ইবনু ওয়ায়িল নামক এক ব্যক্তি একখণ্ড পুরাতন হাড়সহ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দু আঙ্গুলি দ্বারা তাকে ঘষা দিয়ে বলল, এমন অবস্থার পরও কি পুনরায় এটা জীবিত হবে? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, তুই দোযখে প্রবেশ করবি। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ .... ترجعون*

অর্থঃ- *মানুষের কি এটা জানা নেই যে, আমি তাকে শুক্র-বিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে লাগল? আর সে আমার সম্বন্ধে এক অভিনব বিষয় বর্ণনা করল এবং সে নিজের মূল সৃষ্টিকে ভুলে গেল; সে বলে যে, কে জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে, যখন তা পঁচে গেল? আপনি বলে দিন, ঐগুলোকে তিনিই পুনর্জীবিত করবেন যিনি প্রথম বার ঐগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি করাতেই সুবিজ্ঞ। তিনি এরূপ যিনি তাজা বৃক্ষ হতে তোমাদের জন্য অগ্নি উৎপাদন করে থাকেন, অতঃপর তোমরা তা হতে আরো অগ্নি প্রজ্বলিত করে থাক। আর যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি এতে সক্ষম নন যে, এতদনুরূপ মানুষকে (পুনর্বার) সৃষ্টি করেন; নিশ্চয় তিনি সক্ষম এবং তিনি মহাস্রষ্টা, অতিশয় জ্ঞানী। যখন তিনি কোন বস্তুকে (সৃষ্টি করতে) ইচ্ছে করেন, তখন তাঁর নিয়ম এই যে, তিনি ঐ বস্তুকে বলেন, "হয়ে যা" অমনি তা হয়ে যায়। অতএব, তাঁর সত্তা পবিত্রতম, যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেক কাজের পূর্ণ ক্ষমতা এবং তোমাদের সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।*

(সূরাঃ ইয়াসীন-৭৭-৮৩)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আবী হাতিম ইবনু-আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আ'স ইবনু ওয়ায়িল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ্ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন। (ইবনু কাসীর)

---

(৩) শানে নুযূলঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবূ তালিব অসুস্থ হলে কুরাইশ সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি তার নিকটে আসল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তথায় পদার্পণ করলেন। কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে তার নিকট অভিযোগ করল। আবূ তালিব বলল, তুমি কি চাও? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি চাই শুধু একটি বাক্য, যদ্দারা সারা আরবদেশ তাদের বশীভূত হবে। সমস্ত অনারব দেশগুলো জিযিয়া কর দিবে। তিনি বললেন সে বাক্যটি কী? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" কুরাইশরা বলতে লাগল, নিন্, সমস্ত উপাস্যের অস্তিত্ব লোপ করে এক উপাস্য স্থির করে দিল। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

صٓ - وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ .... عَذَابِ *

অর্থঃ- *স্ব-দ, কুরআনের শপথ, যা নসিহতে পরিপূর্ণ; বরং এ কাফিররা বিদ্বেষ ও (সত্যের) বিরোধিতায় (লিপ্ত) রয়েছে। তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি; সুতরাং তারা আর্তনাদ করেছিল, আর সে সময় মুক্তির সময় ছিল না। ঐ (কুরাইশী) এ কথায় বিস্মিত হল যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন ভয় প্রদর্শকরূপে আগমন করেছেন, এবং কাফিররা বলতে লাগল, এ ব্যক্তি যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সেকি এতগুলো উপাস্যের স্থলে মাত্র একজন উপাস্য করে দিল? বাস্তবিকই এটাতো বড় বিস্ময়কর ব্যাপার। এবং ঐ কাফিরদের সরদারগণ (স্বদলীয় লোকদেরকে) এই বলে চলল যে, চল এবং নিজ উপাস্যদের উপর অটল থাক, (কেননা) এটা অর্থাৎ, তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা, এ নবীর) কোন উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার। আমরা তো এরূপ কথা (আমাদের অতীত ধর্মে) শুনিনি এটা (এ ব্যক্তির) মনগড়া উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমাদের সকলের মধ্য হতে কি কেবল এ ব্যক্তিরই উপর আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে? বরং এরা আমার ওয়াহী সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, তারা এখন পর্যন্ত আমার আযাবের স্বাদ পায়নি।* (সূরাঃ স্ব-দ-১-৮)

ব্যাখ্যাঃ- এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভূমিকা এই যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভাতিজার পূর্ণ দেখা-শোনা ও হিফাযত করে

যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কুরাইশ সরদাররা এক পরামর্শ সভায় মিলিত হল। এতে আবূ জাহাল, আ'স ইবনু ওয়ায়িল, আসওয়াদ ইবনু মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনু ইয়াগুস ও অন্যান্য সরদাররা যোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবূ তালিব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। বলবেঃ আবু তালিবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবূ তালিব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই, যাতে সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।

সে মতে তারা আবূ তালিবের কাছে গিয়ে বললঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা করে। অথচ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনাহীন, নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র; তোমাদের স্রষ্টাও নয়, অন্নদাতাও নয়। তোমাদের কোন লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়। আবূ তালিব রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মজলিসে ডেকে এনে বললেনঃ ভাতিজা, এ কুরাইশ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর ইবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কুরাইশের লোকেরাও বলাবলি করে।

অবশেষে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?" আবূ তালিব বললেনঃ সে বিষয়টা কি? তিনি বললেনঃ আমি তাদেরকে এমন একটি কালিমা বলাতে চাই, যার

বদৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবূ জাহাল বলে উঠলঃ বল, সেই কালিমা কি? তোমার পিতার কসম আমরা এক কালিমা নয়, দশ কলেমা বলতে প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ব্যাস "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বললঃ আমরা কি সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন করব? এ যে বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেও সূরা স্ব-দের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

(ইবনু-কাসীর)

---

(৪) শানে নুযূলঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কার কাফিরদেরকে এক আল্লাহর উপাসনা করার জন্য আহ্বান করলেন, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা তিনশ ষাটটি দেবদেবীর উপাসনা করে থাকি। এদের দ্বারা একটি শহরের শৃঙ্খলা বিধানই সুচারুরূপে হয়ে উঠছেনা। আর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, পৃথিবীর সবকিছুর মা'বূদই একমাত্র আল্লাহ, যিনি সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় কার্যাবলী নির্বাহ করে থাকেন, এ কেমন করে সম্ভব? তাঁর এ দাবী সত্য হলে তিনি এর প্রমাণ আনুন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ـ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ـ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ *

অর্থঃ- *নিশ্চয় আসমান সমূহ ও পৃথিবী সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির আগমনে এবং জাহাজসমূহে যা সমুদ্রে চলাচল করে মানুষের লাভজনক পণ্যদ্রব্য নিয়ে, আর পানি, যা আল্লাহ আকাশ হতে বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে সতেজ করেন; তা অনুর্বর হবার পর; সর্বপ্রকারের জীব-জন্তু তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন ; আর বায়ুরাশির পরিবর্তনে এবং মেঘমালায়-যা আকাশ ও যমীনের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে, নিশ্চয় সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।*

(সূরাঃ বাকারা-১৬৪)

ব্যাখ্যাঃ- আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোন কিছুর ক্ষতি সাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যের আওতায় ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ'মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা কি পৃথক পৃথকভাবে সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ *

"আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত ডোবা-নালায় সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন।

---

(৫) শানে নুযূলঃ মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আপনি যে আল্লাহর কথা বলেন তাঁর পরিচয় ও বংশ সূত্র এখনো জানতে পারলাম না। তখনই সূরা ইখ্লাস নাযিল হয়।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ *

অর্থঃ- *আপনি (তাদেরকে) বলে দিন যে, তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই, আর তিনি কারো সন্তান নন। আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।* (সূরাঃ ইখলাস-১-৪)

ব্যাখ্যাঃ- তিরমিযী ও হাকিম প্রমুখের রিওয়ায়াতে আছে, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এ সূরা নাযিল হয়। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, মদীনার ইয়াহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। (কুরতুবী)

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল-আল্লাহ্ তা'আলা কিসের তৈরী, স্বর্ণরৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরার ফাযীলাত ঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে আরয করলঃ আমি এ সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেনঃ এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করাবে। (ইবনু কাসীর)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা ইখলাস

পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেনঃ এ সূরাটি কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম, তিরমিযী)

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক দীর্ঘ রিওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট হয়। (ইবনু কাসীর)

উকবা ইবনু আমির (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও কুরআনসহ সব কিতাবেই রয়েছে। রাতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়োনা, যতক্ষণ সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস না পাঠ কর। উকবা (রাঃ) বলেন ঃ সেদিন থেকে আমি কখনও এ আমল ছাড়িনি। (ইবনু কাসীর)

অলৌকিক কুরআন প্রসঙ্গ

(১) শানে নুযূলঃ কুরাইশ কাফিররা বলল, হে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা তো কোন জ্ঞানী লোককে দেখছিনা যে, সত্য নবী মনে করে তোমার উপর ঈমান এনেছে। আমরা ইয়াহুদী আলিমদেরকে তাওরাতে তোমার কোন পরিচয় আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছি। সকলেই অস্বীকার করেছে। এখন এমন নিদর্শন দেখাও যার দ্বারা তোমার পয়গম্বরী প্রমাণিত হয়। এতদসম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً - قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ -

اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى - قُلْ لَّا اَشْهَدُ - قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ *

অর্থঃ- *আপনি জিজ্ঞেস করুন, সাক্ষ্যরূপে কোন্ বস্তু সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ? আপনি বলুন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী আছেন এবং আমার নিকট এ কুরআন ওয়াহীরূপে প্রেরিত হয়েছে; যেন আমি এ কুরআন দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছবে, সকলকে ভয় প্রদর্শন করি; তোমরা সত্যিই কি এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য আরো মা'বূদ রয়েছে? আপনি বলে দিন, আমি তো তেমন সাক্ষ্য মোটেই দিচ্ছি না, আপনি বলে দিন, তিনিই তো একক মা'বূদ, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের শরীক সাব্যস্ত করা হতে পবিত্র।* (সূরাঃ আন'আম-১৯)

ব্যাখ্যাঃ- তাফসীর ইবনু কাসীর থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা এই কুরআনকে এমন উত্তমরূপে জানে যেমন উত্তমরূপে জানে তারা নিজেদের পুত্রদেরকে। কেননা, তাদের কিতাবে পূববর্তী নাবীদের সংবাদ রয়েছে। তাঁরা সবাই মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অস্তিত্ব লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর গুণাবলী, তাঁর দেশ, তাঁর হিজরত, তাঁর উম্মতের গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে খবর দিয়ে গেছেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন; "যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তারা ঈমান আনবে না" অথচ ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার যে, নবীগণ তাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন এবং প্রাচীন যুগ থেকে তাঁর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

---

(২) শানে নুযূলঃ- আবূ সুফইয়ান, ওয়ালীদ, শাইবা, উবাই, উবাই ইবনু খালফ এবং নযর ইবনু হারিস কা'বা শরীফে একত্রিত হয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুরআন পাঠ শুনত। নযর ইবনু

হারিসকে কেউ জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলে? সে বলল, আমি জানিনা কি বলে। ঠোঁট নাড়ে এবং প্রাচীন যুগের কাহিনী সমূহ পাঠ করে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ - وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا - وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا- حَتّٰى اِذَاجَآءُوكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ *

অর্থঃ- *আর তাদের মধ্যে কতিপয় এমনও আছে যে, (আপনি কুরআন পাঠকালে) আপনার দিকে কর্ণপাত করে, আর আমি তা (অর্থাৎ কুরআন) হৃদয়ঙ্গম করা হতে তাদের অন্তর সমূহের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি এবং তাদের কর্ণসমূহে ছিপি দিয়ে রেখেছি। আর যদি সমস্ত প্রমাণাদিও প্রত্যক্ষ করে নেয় তবুও তারা তখন আপনার সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া করে, কাফিররা বলে যে, ইহাতো প্রাচীনদের ভিত্তিহীন কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।* (সূরাঃ আনআম-২৫)

ব্যাখ্যাঃ- জনগণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করলে আবূ তালিব তাদেরকে বাধা দিতেন। সে সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। সাঈদ ইবনু আবূ হিলাল বলেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দশজন চাচা সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারা সবাই লোকদেরকে তাঁকে হত্যা করা থেকে বাধা প্রদান করতো বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তারা নিজেরা ঈমানের বরকত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকতেন। সুতরাং তাঁরা ছিলেন বাহ্যতঃ তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু ভিতরে ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারী। এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, তারা নির্বুদ্ধিতা বশতঃ নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা এ কথাটা মোটেই বুঝতে পারছে না যে, তারা নিজেরাই

নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংস টেনে আনছে।

যাহ্হাক, কাতাদাহ্, মুহাম্মদ ইবনু হানাফিয়া (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াত মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কুরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবূ তালিব ও আরও কয়েকজন চাচা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। (মাযহারী)

---

(৩) শানে নুযূলঃ- মালেক ইবনু সাইফ নামে একজন ইয়াহুদী একদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ধর্ম বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলল যে, কোন মানুষের উপরই আল্লাহ কোন কিতাব নাযিল করেননি।

অন্য এক রিওয়ায়াত মতে এক ইয়াহুদী এরূপ বলেছিল যে, "আল্লাহর শপথ আকাশ হতে আল্লাহ কোন কিতাব নাযিল করেননি"। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمَاقَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْقَالُوْا مَآاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ- قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا- وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ - قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ *

অর্থঃ- *আর তারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা সেরূপ ভাবে উপলব্ধি করেননি, যেরূপ উপলব্ধি করা উচিত ছিল, যখন তারা এরূপ বলে ফেলল যে, আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন বস্তুই নাযিল করেননি; আপনি বলুন, সে কিতাবটি কে নাযিল করেছে? যা মূসা আনয়ন করেছিলেন যার অবস্থা এই যে, তা নূর এবং মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক, যাকে তোমরা বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, তা (কিছু) প্রকাশ করে থাক এবং অনেক বিষয় গোপন কর, আর তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরাও জানতেনা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও না; আপনি বলে দিন, আল্লাহই কুরআন নাযিল করেছেন, অতঃপর তাদেরকে তাদের নিজ নিজ অনর্থক কর্মে লিপ্ত থাকতে দিন।* (সূরাঃ আনআম-৯১)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছেনঃ যারা এমন বাজে কথা বলছে, তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে চিনেনি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হত না। যারা সর্বাবস্থায় ঐশী গ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে তাওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির 'চৌধুরী' হয়ে বসে আছ, সে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরও বলে দিনঃ তোমরা এমন বাঁকা পথের যাত্রী যে, তোমরা যে তাওরাতকে ঐশীগ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা একে বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোন পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। তাওরাতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইয়াহুদীরা সেগুলো তওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল।

---

(৪) শানে নুযূলঃ- কাফিররা বলতে লাগল হে মুহাম্মদ! তুমি বলে থাক মূসা (আঃ) লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করলে বারটি ঝরণা প্রবাহিত হয়। ঈসা (আঃ) ফুঁ দিয়ে মৃতকে জীবিত করতেন। তুমিও অনুরূপ কোন মু'জিযা দেখালে আমরা ঈমান আনব। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তা হলে ঈমান আনবে তো? তারা কসম করে প্রতিশ্রুতি দিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করতে উদ্যত হলে, জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এ মু'জিযা না মানলে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ـ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ*

অর্থঃ- *আর তারা (কাফিররা) শপথ সমূহে খুব দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করল যে, যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত হয়, তবে তারা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে; আপনি বলে দিন, নিদর্শনগুলো সমস্তই আল্লাহর অধিকারে এবং তোমাদের তার কি খবর যে, এ নিদর্শনগুলো যখন উপস্থিত হবে তখনো তারা ঈমান আনবে না।*
(সূরাঃ আনআম-১০৯)

ব্যাখ্যাঃ- মুশরিকরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে-যদি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোন মু'জিযা দেয়া হয় এবং তার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় তবে ঈমান আনবে। তাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন, হে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তুমি তাদেরকে বলে দাও, মু'জিযা তো আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে মু'জিযা প্রদান করবেন, ইচ্ছা না করলে না করবেন।

কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছিল-"হে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি তো আমাদেরকে বলেছেন যে, মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিখানা পাথরের উপর মারা মাত্রই তাতে বারোটি ঝরণা বের হয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করতেন। সামূদ জাতিও (সালিহ আঃ-এর কাছে) উঁটের মু'জিযা দেখেছিল। সুতরাং আপনিও যদি এ ধরনের কোন মু'জিযা আমাদের সামনে পেশ করতে পারেন তবে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নেবো।" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে বলেছিলেনঃ "তোমরা কি মু'জিযা দেখতে চাও?" "তারা উত্তরে বলেছিলঃ "এই সাফা পাহাড়কে আমাদের জন্যে সোনা বানিয়ে দিন।" তিনি তাদেরকে বলেনঃ "যদি এরূপ হয়ে যায় তবে তোমরা একত্ববাদে বিশ্বাস করবে তো?" তারা উত্তরে বলেঃ "হ্যাঁ, আমরা সবাই ঈমান আনবো।" তিনি তখন উঠেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং বলেনঃ "আপনি চাইলে সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করা হবে। কিন্তু তারপরেও যদি তারা ঈমান না আনে তবে তৎক্ষণাৎ তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসবে। আর আপনি ইচ্ছা করলে এদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হোক। কেননা, হয়তো পরবর্তীকালে এদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমান আনবে এবং তাওবা করবে।" তাই, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তারা কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে কসম করে বলে.... তারা ঈমান আনবে।" কিন্তু কথা এই যে, তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ ও মূর্খ। আল্লাহ পাক বলেনঃ মু'জিযা প্রেরণে আমার কাছে শুধু এটাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা মু'জিযা দেখার পরেও ঈমান আনেনি। সুতরাং এরাও যদি মু'জিযা দেখার পরেও ঈমান আনয়ন না করে তবে সাথে সাথেই তাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে এবং যে অবকাশ তাদেরকে দেয়া হয়েছে তা আর থাকবে না।

এতে কাফিরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রার্থিত মু'জিযা প্রকাশিত হলে মুসলমান হওয়ার জন্যে শপথ করল। এর পরবর্তী আয়াতে

তাদের উক্তির জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, মু'জিযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যেসব মু'জিযা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল এবং যেসব মু'জিযা দাবী করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবী করার কোন অধিকার নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাতের দাবীদার এবং এ দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মু'জিযা আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের আছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবী করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেমন, আদালতে কোন বিবাদী বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ না করেই দাবী করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নেব। বাদীর এ উদ্ভট দাবীর প্রতি কোন আদালতই কর্ণপাত করবে না।

এমনিভাবে নবুওয়াত ও রিসালাতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মু'জিযা প্রকাশিত হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদের এরূপ বলার অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের মু'জিযা দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করব।

---

(৫) শানে নুযূলঃ- হিজরতের পূর্বে এক হজ্জের রাতে মক্কার কাফিররা কোন এক স্থানে একত্রিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে তথায় গমন করলে তারা বলল, তুমি সত্য নবী হলে এ চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখাও। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এক খণ্ড আবূ কুবাইস পাহাড় এবং অপর খণ্ড কাইকাআন পাহাড়ের দিকে সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় মিলিত হয়ে গেল। ইহা দেখে কাফিররা বলল, "তুমি তো বড় যাদুকর!" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি কখনো মিথ্যা বলেছি?

আমি কি যাদু শিখেছি? তারা বলল, না। তখন নিম্নের আয়াতগুলো নাযিল হয়।

اقتربت الساعة وانشق القمر - وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر*

অর্থঃ- *ক্বিয়ামত নিকটে এসে পড়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। আর যদি তারা কোন মু'জিযা দেখে, তবে টাল-বাহানা করে এবং বলে, ইহাতো চিরাগত যাদু।* (সূরাঃ ক্বামার-১-২)

ব্যাখ্যাঃ- ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুওয়াতের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ্ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে ও অপরখণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সবাইকে বললেনঃ দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মু'জিযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মু'জিযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগলঃ মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে যাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

---

(৬) শানে নুযূলঃ- একদা ওয়ালীদ ইবনু মুগীরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুরআন পড়া শুনে ইসলারে প্রতি আকৃষ্ট হল।

ইহা দেখে আবূ জাহাল প্রমুখ কুরাইশ সর্দারগণ প্রমাদ গণল এবং বলল যে, তুমি কবি ও গণকের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছ? ওয়ালীদ বলল, আমি নিজে কবি, কাজেই বুঝতে পারি যে, কুরআন কবির রচনাও নয়, গণকের উক্তিও নয়। তবে যেহেতু ইহা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়, কাজেই মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুকর বলা যেতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এ সম্বন্ধেই নাযিল হল।

ذرني ومن خلقت وحيدا - وجعلت له مالا ممدودا - وبنين شهودا - ومهدت له تمهيدا............ ساصليه سقر*

অর্থঃ- *ঐ ব্যক্তিকে আমার হাতে ছেড়েদিন, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী। আর তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছি এবং নিকটে অবস্থানকারী পুত্রগণও, এবং সর্ব প্রকারের সরঞ্জাম তার জন্য ব্যবস্থা করেছি, তবুও সে এ লালসা করে যে, আরো অধিক দেই। কখনই নয়, সে আমার আয়াত সমূহের বিরোধী, অচিরেই তাকে দোযখের (সাউদ) পর্বতে চড়াইব; সে চিন্তা করল, তারপর একটা মন্তব্য স্থির করল, সুতরাং সে ধ্বংস হোক, কেমন মন্তব্য স্থির করল'! অনন্তর সে ধ্বংস হোক, কেমন মন্তব্য স্থির করল! অতঃপর দৃষ্টি করল, তৎপর মুখ বিকৃত করল, আরও অধিক বিকৃত করল, তৎপর মুখ ফিরাল এবং গর্ব করল। অনন্তর বলল ইহা তো নকল করা যাদু। ইহা তো মানুষের উক্তি, অচিরেই আমি তাকে দোযখে প্রবেশ করাব।* (সূরাঃ মুদ্দাসসির-১১-২৬)

ব্যাখ্যাঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন এই আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিলেন। ওয়লীদ ইবনু মুগীরা এই তিলাওয়াত শুনে একে আল্লাহর কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধ্য হয় যে-"আল্লাহ্র শপথ, আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ ধরনের এক

বর্ণাঢ্যতা। এর বাহ্যিক আবরণ হৃদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। এটা নিশ্চিতই সবার উর্ধ্বে থাকবে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।"

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, ওসব কথা স্বীকার করার পরও শুধুমাত্র অহংকার এবং বিদ্বেষবশতঃই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়তে স্বীকৃতি না দিয়ে বিরুদ্ধাচরণের পথ বেছে নিল।

---

(৭) *শানে নুযূলঃ* আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ যে কাতিবে ওয়াহী ছিল। যখন এ মর্মে আয়াত নাযিল হয় যে, "আমি মানুষকে খাঁটি মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, অতঃপর মাংস পিণ্ড হতে"- তখন ওয়াহী লিখক বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল" ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন"। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, লেখ, সামনের দিকে এটাই আছে। এতে আব্দুল্লাহ্র সন্দেহ হল এবং মুরতাদ্দ হয়ে বলতে লাগল, মুহাম্মদ যদি সত্য নবী হয়, তবে তো আমার প্রতিও ওয়াহী আসছে। আমি যা বললাম, সেও তো তাই বলে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰي عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ .... تَسْتَكْبِرُوْنَ*

অর্থ ঃ- *আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম কে হবে; যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে? অথবা এরূপ বলে যে, আমার নিকট ওয়াহী আসে, অথচ তার নিকট কোন বিষয়েই ওয়াহী আসেনি, আর যে ব্যক্তি এরূপ বলে যে, যেরূপ কালাম আল্লাহ নাযিল করেছেন তদ্রূপ কালাম আমিও আনয়ন করি; আর যদি আপনি সে সময়ে দেখেন যখন এ যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় (অভিভূত) হবে এবং ফিরিশ্তাগণ স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে থাকবে, (এবং বলবে) নিজেদের প্রাণগুলো বের কর; আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি অসত্য বলতে এবং তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ (কবূল করা) হতে অহংকার করতে।* (সূরাঃ আন'আম-৯৩)

ব্যাখ্যাঃ- যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায সংরক্ষণ করে। এতে ইয়াহুদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ, যা ইচ্ছা মেনে নেয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরী করা- এটি পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, অবশ্যই তা তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরোয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে। চিন্তা করলে দেখা যায়, পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শির্কসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহভীতি এবং পরকালভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কুরআন মাজীদের কোন সূরা এমন নেই, যাতে পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারীদের চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? সে তাঁর শরীক স্থাপন করছে বা বলছে যে, তাঁর সন্তান রয়েছে, কিংবা দাবী করছে যে, আল্লাহ তাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, অথচ তাকে পাঠানো হয়নি। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে বলছে যে, তার কাছেও ওয়াহী পাঠানো হয়েছে, অথচ তার কাছে তা পাঠানো হয়নি। ইকরামা ও কাতাদা বলেন যে, এই আয়াতটি মুসাইলামা কায্যাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যে বলে, আল্লাহ যেমন

কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আমিও তদ্রুপ অবতীর্ণ করতে পারি। অর্থাৎ সে দাবী করছে যে, আল্লাহর মত ওয়াহী সেও অবতীর্ণ করতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ *

অর্থাৎ "যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে-আমরা শুনলাম এবং ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি।"

---

(৮) *শানে নুযূলঃ*- নবুওয়াত প্রাপ্তির নিকটবর্তী কালে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে একাধারে কয়েকদিন নির্জনে অবস্থান করতেন। একদিন জিবরাঈল (আঃ) এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন "পড়ুন" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি তো পড়তে শিখিনি। জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে তিন বার সজোরে আলিঙ্গন করলেন এবং শেষ বারে পড়তে বললে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়লেন।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ....مَا لَمْ يَعْلَمْ *

অর্থ ঃ *হে নবী! আপনি নিজ প্রভুর নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আপনি কুরআন পাঠ করুন। আর আপনার প্রভু অত্যন্ত দয়াবান। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।*

(সূরাঃ 'আলাক্ব-১-৫)

ব্যাখ্যাঃ- এখানে اسم শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখনই কুরআন পড়বেন, আল্লাহর নাম, অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেশকৃত ওযরের জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী; লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বাক্-নৈপুণ্য, বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞান ও প্রাঞ্জলতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল। (মাযহারী)

এস্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্র 'রব' নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা। শিক্ষার সর্ব প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন। আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতক্রমে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সে মতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহ্র কাছে আরশে রক্ষিত আছে। (কুরতুবী)

ক্বিয়ামতের বিবরণ

(১) *শানে নুযূলঃ*- কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! দুনিয়াতে আপনাকে দেখার আগ্রহ হওয়া মাত্র খিদমতে হাজির হয়ে দর্শন লাভ করতে পারি। কিন্তু বেহেশ্তে আপনি অনেক উচ্চ স্তরে অবস্থান করবেন, সেখানে আমরা আপনার দর্শন লাভ করব কেমন করে? তদুত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ

عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ - وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا *

অর্থঃ- *আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হয়, তবে এরূপ ব্যক্তিগণও সে মহান ব্যক্তিগণের সহচর হবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ নবীগণ ও সিদ্দীক্বগণ এবং শহীদগণ এবং নেককারগণ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।* (সূরাঃ নিসা-৬৯)

ব্যাখ্যাঃ- তাফসীর ইবনু জারীরে রয়েছে, সাঈদ ইবনু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একজন আনসারী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগমন করেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখে চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এখানে তো সকাল সন্ধ্যায় আমরা আপনার খিদমতে এসে উঠা বসা করছি এবং আপনার মুখমণ্ডলও দর্শন করছি। কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন তো আপনি নবীগণের সমাবেশে সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন। তখন তো আমরা আপনার নিকট পৌঁছাতে পারবো না! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন উত্তর দিলেন না। সে সময় জিবরাঈল (আঃ) এ আয়াতটি আনয়ন করেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন লোক পাঠিয়ে উক্ত আনসারীকে সুসংবাদ প্রদান করেন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্নিধ্য লাভ কোন বর্ণ-গোত্রের উপর নির্ভরশীল নয়। তিব্‌রানী (রহঃ) জামে কবীর গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর এ রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক হাবশী ব্যক্তি মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন, -"ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি, রং উভয় দিক দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নবুওয়তের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে

আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব।"

মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি তোমার হাবশীসুলভ বদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সে সত্তার কসম, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রংয়ের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দুরত্বে থেকেও চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (কালিমায়) বিশ্বাসী হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহ্‌র দায়িত্বে এসে যায়। আর যে লোক 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি পড়ে, তার আমলনামায় এক লাখ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়।"

---

(২) শানে নুযূলঃ- ক্বুরাইশ কিংবা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের কাফিররা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল, ক্বিয়ামত কখন হবে? তদুত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا - قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لَايُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ - ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً - يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا - قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ *

অর্থঃ- *তারা আপনার নিকট ক্বিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে যে, কখন তা সংঘটিত হবে? আপনি বলে দিন যে, তার খবর কেবল মাত্র আমার প্রভুর কাছেই রয়েছে। তাকে তার সময় মত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ প্রকাশ করবে না। তা আসমান এবং যমীনের অতি গুরুতর ব্যাপারে হবে; তা কেবল তোমাদের উপর আকস্মাৎই এসে পড়বে। তারা আপনাকে*

এমনভাবে জিজ্ঞেস করে, যেন আপনি তার অনুসন্ধান করে রেখেছেন। আপনি বলে দিন, তার খবর একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অবগত নয়। (সূরাঃ আ'রাফ-১৮৭)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই, এরা আপনার নিকট ক্বিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে। এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোন মাধ্যম থাকবে না। কিয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তা না হলে যারা বিশ্বাসী তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকির তারা অধিকতর ঠাট্টা-বিদ্রুপের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে ঃ

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

অর্থাৎ, কিয়ামত তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবেই এসে উপস্থিত হবে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামাতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে। এক লোক ক্রেতাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদাগর) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে ক্বিয়ামাত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউজ মেরামত করতে থাকবে-তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হয়ে

যাবে। কেউ হয় তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কিয়ামাত হয়ে যাবে। (রূহুল-মা'আনী)

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে ক্বিয়ামাতকেও-যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে একে তো এতেই বিশ্বাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ সময়ের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রুপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ঔদ্ধত্য অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

সেজন্যই হিকমাত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন-ক্ষণকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধ প্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেয়া হয়েছে যে, কোন একদিন ক্বিয়ামাতের আগমন ঘটবে, আল্লাহ্র সমীপে সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের নিকাশ নেয়া হবে। যার ফলে হয় জান্নাতের অকল্পনীয় ও অনন্ত নিয়ামতরাজি লাভ হবে অথবা জাহান্নামের সেই কঠিন ও দুর্বিষহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকবে, তখন কোন বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন সংঘটিত হবে। বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবী হল বয়সের অবকাশকে গনীমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরী হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশ লংঘন করতে গিয়ে এমনভাবে ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়।

---

(৩) শানে নুযূলঃ- দুররুল মানসূর কিতাবে বর্ণিত যে, কাফিরদের মধ্যে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ক্বিয়ামাতের সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করত যে, তা কখন ঘটবে? নিম্নোক্ত আয়াতে উত্তর বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ - وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ - وَيَعْلَمُ مَافِى الْأَرْحَامِ - وَمَاتَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا - وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ - اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ *

অর্থঃ- *নিঃসন্দেহে ক্বিয়ামতের সংবাদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন, এবং তিনিই অবগত আছেন যা কিছু গর্ভাধারে রয়েছে। এবং কেউ জানেনা যে, সে আগামীকল্য কি অর্জন করবে এবং কেউ জানেনা যে, সে কোন্ স্থানে মরবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই (সে) সমস্ত বিষয়ে অবগত (ও) অবহিত আছেন।* (সূরাঃ লুক্বমান-৩৪)

ব্যাখ্যাঃ- প্রথমোক্ত তিন বস্তু প্রকাশ্যতঃই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে মানুষের জ্ঞানের কোন অধিকার না থাকাটাই সুস্পষ্ট। এ জন্যে এক্ষেত্রে হাঁ সূচক শিরোণাম অবলম্বন করে সেগুলো আল্লাহ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, ক্বিয়ামত তো এক সুনির্দিষ্ট বিষয়-এতে কোন নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়-এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। কিন্তু ক্রিয়াবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এ জন্যেই একে উভয় স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের (সন্তান ধারণ) ক্ষেত্রে তো আল্লাহ তা'আলার ইলমের উল্লেখ রয়েছে (অর্থাৎ, মার্তৃগর্ভে কি রয়েছে তা

তিনিই জানেন) এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে এলমের উল্লেখ নেই। এর কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুষঙ্গিকভাবে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সাথে মানব জাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা মহান আল্লাহ্ কর্তৃকই বর্ষিত হয়। এতে অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। অতএব, এ সম্পর্কিত জ্ঞান বাক্যের বর্ণনাভঙ্গি থেকেই প্রমাণিত হয়।

হিজরত প্রসঙ্গ

(১) শানে নুযূলঃ- হিজরতের পূর্বে মক্কার কাফিররা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত। এ কারণে কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে জিহাদের জন্য অনুমতি চাইতেন। তিনি বলতেন, এখনো জিহাদের অনুমতি আসেনি; অতএব, ধৈর্যধারণ কর। হিজরতের পর যখন জিহাদের আদেশ পৌঁছল, তখন স্বভাবতঃ কারো কারো মনে ইহা কঠিন বলে মনে হল। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ - فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ .... فَتِيْلًا *

অর্থঃ- *তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি, যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, স্বীয় হাতসমূহকে বিরত রাখ এবং নামাযের পাবন্দী কর এবং যাকাত প্রদান করতে থাক। অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করে দেয়া হল, তখন ঘটনা এ দাঁড়াল যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ মানুষকে এরূপ ভয় করতে লাগল, যেরূপ আল্লাহকে ভয় করে। বরং তদাপেক্ষাও অধিক। এবং এরূপ বলতে লাগল, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন*

ফরয করে দিলেন। আমাদেরকে যদি আরো কিছু সময় অবকাশ দিতেন। আপনি বলে দিন, পার্থিব ভোগ-বিলাস কেবল কয়েক দিনের জন্যে, আর পরকাল ঐ ব্যক্তির জন্য সর্বদিক দিয়ে উত্তম, যে আল্লাহর বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকে। আর তোমাদের অধিকার একসুতা পরিমাণও খর্ব করা হবেনা।

(সূরাঃ নিসা-৭৭)

ব্যাখ্যাঃ- ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন মুসলমানরা মক্কায় অবস্থান করছিল তখন তারা ছিল দুর্বল। তারা মর্যাদাসম্পন্ন শহরে বাস করছিল। সেখানে কাফিরদেরই প্রাধান্য বজায় ছিল। মুসলমানরা তাদেরই শহরে ছিল। কাফিরেরা সংখ্যায় খুব বেশী ছিল এবং যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল তাদের অধিক। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেননি। বরং তাদেরকে কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে আরও আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেসব হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করেছেন, ঐগুলোর উপর যেন তারা আমল করে। যেমন, তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে। সাধারণতঃ যদিও তখন তাদের মালের আধিক্য ছিল না তথাপি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার নির্দেশ দেন।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে এটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন যে, তারা যেন এখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে বরং সবর ও ধৈর্যের দ্বারাই যেন কাজ নেয়। আর ওদিকে কাফিররা ভীষণ বীরত্বের সাথে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের পাহাড় চাপিয়ে দেয়। তারা ছোট-বড় প্রত্যেককেই কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দিতে থাকে। কাজেই মুসলমানগণ অত্যন্ত সংকীর্ণতার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছিল। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যেতো এবং তারা কামনা করতো যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দিতেন।

অবশেষে যখন তাদেরকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেয়া হয় তখন মুসলমানরা স্বীয় মাতৃভূমি, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে মদীনায় হিজরত করেন। তথায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সর্বপ্রকারের সুবিধা ও নিরাপত্তা দান করেন। সাহায্যকারী হিসেবে তারা মদীনার আনসারদেরকে পেয়ে যায় এবং তাদের সংখ্যাও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া তারা যথেষ্ট শক্তিও অর্জন করে।

তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে যুদ্ধ করে। জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই কতক লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। জিহাদের কথা চিন্তা করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং স্ত্রীদের বিধবা হওয়া ও শিশুদের পিতৃহীন হওয়ার দৃশ্য তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। ভয় পেয়ে তারা বলে উঠে-'হে আমাদের প্রভু! এখনই কেন আমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করলেন? আমাদেরকে আরও কিছুদিন অবসর দিতেন।' এ বিষয়কেই অন্য আয়াতে নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

এর সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই, মুমিনগণ বলে- (যুদ্ধের) কোন সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় এবং তাতে জিহাদের বর্ণনা দেয়া হয় তখন রুগ্ন অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা চীৎকার করে উঠে এবং ভ্রুকুঞ্চিত করে তোমার দিকে তাকায় এবং ঐ ব্যক্তির মত চক্ষু বন্ধ করে নেয় যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অচৈতন্য হয়ে থাকে। তাদের জন্যে আফসোস!

(ইবনু কাসীর)

মুসলমানগণ যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহ্য হয়ে তারা জিহাদের নির্দেশ কামনা করতেন। কিন্তু মদীনায় হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শান্তি ও আরাম-আয়েশ লাভে সমর্থ হন, আর এমনি অবস্থায় যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধ স্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল না। সেজন্য তারা শুধু বাসনা করল যে, এক্ষণই যদি জিহাদের নির্দেশটি না আসত, তবেই ভাল হত। এই বাসনাকে আপত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়ে সে সমস্ত মুসলমানকে পাপী সাব্যস্ত করা আদৌ সমীচীন নয়।

মুসলমানগণ যদি উল্লেখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন, তবে উল্লেখিত বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ না করে থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্বরূপ এসে থাকে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আয়াতে উল্লেখিত শব্দের দ্বারা এমন কোন সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তাঁরা মনের কল্পনাকে মুখেও প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তাঁরা হয়ত মনে মনেই বলে থাকবেন!-(বয়ানুল কুরআন) কোন কোন তফসীরকারের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নয়, বরং মুনাফিকদের সাথে। সেক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই থাকে না। (তফসীরে কবীর)

*

(২) শানে নুযূলঃ- হিজরতের অনুমতি হওয়া মাত্র রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে কেবল আবূ বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) কে রেখে প্রায় সকল মুসলমানরাই মদীনায় চলে গেলেন। এটা দেখে কুরাইশগণ পরামর্শ সভায় একত্রিত হল। বিভিন্ন মত বিনিময়ের পর আবু জাহাল স্থির করল, আজ রাতেই প্রত্যেক গোত্রের এক একজন নিয়ে দল গঠিত হবে এবং তারা আজই কাজ শেষ করবে। জিবরাঈল (আঃ) এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিলেন। তিনি আলী (রাঃ) কে নিজের বিছানায় শুইয়ে আবূ বকর (রাঃ) কে সঙ্গে নিয়ে "সাওর" নামক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটিতে উল্লেখ হয়েছে।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ - وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ - وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ *

অর্থঃ- *আর সে ঘটনাও স্মরণ করুন, যখন কাফিরগণ আপনার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধির চিন্তা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে বা আপনাকে নিহত করে ফেলবে বা আপনাকে দেশান্তর করে দেবে। আর তারা তো নিজেদের তদবীর করছিল এবং আল্লাহ আপন তদবীর করছিলেন; আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক দৃঢ় তদবীর কারক।*

(সূরাঃ আনফাল-৩০)

ব্যাখ্যাঃ- হিজরত-পূর্বকালে মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফির পরিবেষ্ঠিত ছিলেন এবং তারা তাঁকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাদের এ অপবিত্র হীন চক্রান্তকে ধূলিসাৎ করে দেন এবং মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে দেন।

তফসীরে ইবনু কাসীর ও মাযহারীতে মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক, ইমাম আহমদ ও ইবনু জারীর (রহঃ) প্রমুখের রিওয়ায়াতক্রমে এ ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদীনা থেকে আগত আনসারদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদীনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদীনায় চলে গেছে, তখন এঁদের একটি কেন্দ্র মদীনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এঁরা যে কোন রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদীনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে শলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে 'দারুন নদওয়াহ'তে এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 'দারুন নদওয়াহ' ছিল মসজিদে-হারাম সংলগ্ন কোসাই ইবনু কিলাবের বাড়ী। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে শলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়ীটিকে

নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামী আমলে এটিকে মসজিদে-হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবুয-যিয়াদাতই' সে স্থান, যাকে তৎকালে 'দারুন-নদওয়াহ' বলা হতো।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কুরাইশ নেতৃবর্গ 'দারুন-নদওয়াহ'তেই সমবেত হয়েছিল যাতে আবূজাহ্‌ল, নযর, ইবনু হারিস, উমাইয়া ইবনু-খালফ, আবু সুফিয়ান প্রমুখসহ সমস্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করে এবং এতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তির মুকাবিলার উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। এখানে বসেই মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়।

কিন্তু নবী-রসূলগণের গাইবী শক্তি সম্পর্কে এ মূর্খের দল কেমন করে জানবে। ওদিকে জিবরাঈল (আঃ) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অবহিত করে এই ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকে রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কুরাইশী নওজোয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই রসূলুল্লাহু সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাড়ীটি অবরোধ করে ফেলে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি লক্ষ্য করে আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

আলী (রাঃ) এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবরোধ ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে ? অতঃপর আল্লাহর নির্দেশক্রমে

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি; অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাবার পর কোন এক আগন্তুক এসে অবেরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? তারা জানাল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন স্বপ্নে মিশে রয়েছ; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গেছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গিয়েছেন। তখন তারা সবাই নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল। (তাবারী ও ইবনুহিশাম)

ইবনু ইসহাক থেকে এবং তিনি মুহাম্মদ ইবনুকাবই তাঁদের উল্লিখিত বিবরণের মূল রাবী। এ রাবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি, রিজাল শাস্ত্রবিদগণ তাঁকে তাবেয়ী বলে উল্লেখ করেছেন।

(তাজরীদ–৬৭৩, ইসাবা–৮-৫৩০)

৪০ হিজরীতে অর্থাৎ আলোচ্য ঘটনার ৪০ বৎসর পরে তার জন্ম হয়।

বুখারী হাদীস গ্রন্থের বিবরণের সাথে এ বিবরণটি মিলিয়ে ফেলায় এবং রাবীদের অবস্থার আলোচনা না করায় এ বিবরণের 'মাটি পড়ার' ঘটনায় আধুনিক লেখকগণ বড়ই সমস্যায় পড়েছেন বলে মনে হয়।

আমরা দেখছি যে, এ বিবরণের সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য ইসলাম আমাদের বাধ্য করেনি। কারণ কুরআনের বা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখে এই ঘটনার কোন উল্লেখ আমরা অবগত হইনি। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগণ হিজরত সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে যে সমস্ত বর্ণনা করেছেন এবং বুখারী হাদীস গ্রন্থসমূহে যে সমস্ত বিবরণের

উল্লেখ আছে তাতে এই মাটি পড়ার কোন উল্লেখ নেই।

আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন। কাজেই তাঁকে তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হলো না। ভোর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর এরা লজ্জিত-অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। এই রাত এবং এতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি আলী (রাঃ)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত।

কুরাইশ সরদারদের রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্পর্কে যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল, সে সবকটিই কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, "সে সময়টি স্মরণযোগ্য যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে, না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দেবে?"

কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধুলিসাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, "অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক," যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

---

(৩) শানে নুযূলঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি হিজরতের নির্দেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় সাহাবী সেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে মদীনায় হিজরত করলেন, কিন্তু কেউ কেউ নিজ মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পদের আকর্ষণে হিজরত করেননি। তাদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ

اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ - وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ *

অর্থঃ- *হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পিতৃগণকে এবং ভ্রাতাগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে প্রিয় মনে করে। আর যারা তোমাদের মধ্য হতে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে, বস্তুতঃ এরূপ লোকেরাই হচ্ছে বড় নাফরমান।* (সূরাঃ তাওবা-২৩)

ব্যাখ্যাঃ- এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মুমিনদেরকে নিষেধ করছেন, যদিও তারা তাদের মাতা, পিতা, ভাই, বোন প্রভৃতি হোক না কেন, যদি তারা ইসলামের উপর কুফরীকে পছন্দ করে নেয়। অন্য আয়াতে রয়েছে অর্থাৎ "(হে নবী!) যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে তুমি পাবে না যে, তারা বন্ধুত্ব রাখবে এমন লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে শত্রুতা রাখে, যদিও তারা তাদের পিতা হয় বা ছেলে হয় অথবা ভাই হয় কিংবা স্বগোত্রীয় হয়। এরা তারাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং স্বীয় বিশেষ রূহ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন, তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করবেন যেগুলোর নীচ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে।" (সূরাঃ মুজাদালাহ-২২)

ইমাম বাইহাকী (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন আবূ উবাইদাহ্ ইবনু জাররাহ (রাঃ)-এর পিতা তাঁর সামনে এসে মূর্তির প্রশংসা করতে শুরু করে দেয়। তিনি তাকে বারবার বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বেড়েই চলে। তখন পিতা-পুত্রে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করে ফেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

(ইবনু কাসীর)

তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফ্‌রকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালংঘনাকারী।"

মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক তা মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ ও রসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত। যেখানে এ দু'সম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ ও রসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক।

---

(৪) শানে নযূলঃ- পূর্বোক্ত আয়াতটি নাযিল হলে হিজরত বিমুখ লোকেরা বলল, এখন আমরা নিজেদের পরিবার বর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে রয়েছি এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে-রত থেকে স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছি, হিজরত করলে সব কিছুই ত্যাগ করতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ *

অর্থঃ- আপনি বলে দিন যে, যদি তোমাদের পিতৃবর্গ এবং তোমাদের

পুত্রগণ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র, আর সে সকল ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ এবং সে ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছো, আর সে গৃহসমূহ– যা তোমরা পছন্দ করছো– (যদি এসব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের চেয়ে এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন ; আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে সরল সত্য পথের অনুগামী করেন না। (সূরাঃ তাওবা – ২৪)

ব্যাখ্যাঃ- অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদেশ করছেন যে, যারা তাদের পরিবারবর্গকে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং স্বগোত্রীয়দেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর প্রাধান্য দেয়, তাদেরকে যেন তিনি ভীতি প্রদর্শন করে বলেনঃ "যদি তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছো, (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের উদ্দিষ্ট স্থল পর্যন্ত পৌঁছান না।"

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেউই (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান এবং সমস্ত লোক অপেক্ষা প্রিয়তম না হই।" (ইবনু কাসীর)

প্রথম, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ফরয হুকুম যখন আসে, তখন এ হুকুম পালন শুধু কর্তব্য আদায় করাই ছিল না; বরং তা ছিল মুসলমান

হওয়ার আলামতও। তাই যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে বিরত ছিল তাদের মুসলমান বলা যেতো না। মক্কা বিজয়ের পর এ আদেশ রহিত হয়। তবে আদেশের মূল বক্তব্য এখনো বলবৎ আছে যে, যে দেশে আল্লাহর আদেশ তথা নামায-রোযা প্রভৃতি পালন সম্ভব না হয়, সামর্থ্য থাকলে সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্যে ফরয।

এজন্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ 'রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।"

সূরা তওবার ২৪তম আয়াতটি নাযিল হয় মূলতঃ ওদের ব্যপারে যারা হিজরত ফরয হওয়ার সময় মক্কা থেকে হিজরত করেনি। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্থ-সম্পদের মায়া হিজরতের ফরয আদায়ে এদের বিরত রাখে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ "যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায় যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ নাফরমানদিগকে কৃতকার্য করেন না।"

---

(৫) শানে নুযূলঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের পক্ষের একদল লোক ইসলাম কবূল করে মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রাদির কান্না-কাটি ও মুহব্বত তাদের হিজরতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তারা হিজরত করতে অক্ষম হয়ে

পড়লেন। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ - وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ
يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ *

অর্থঃ- *কোন মুসীবতই আল্লাহর নির্দেশ ভিন্ন আসেনা। আর যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে (ধৈর্য ধারণ ও সন্তুষ্ট থাকার) পথ দেখিয়ে দেন; আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছেন।* (সূরাঃ তাগাবুন-১১)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেয়া হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এ অংশে বলা হয়েছেঃ যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্যে শত্রুর ন্যায় কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ফরয পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না; বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। কেননা, আল্লাহ তা'আলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

আলিমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্যে বদ দু'আ করা উচিত নয়।
(রূহুল মা'আনী)

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বিধানাবলী উপেক্ষা করে, না মুহব্বতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

শির্ক ও বিদ'আত প্রসঙ্গ

(১) শানে নুযূলঃ- ইসলামের প্রাথমিক যুগে লোকে কুরবানীর জন্তুর রক্ত কা'বা গৃহে মুছে দেয়া মর্যাদার কাজ মনে করত এবং এতে আল্লাহ খুশী হন বলে ধারণা করত। অতঃপর মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করল, তখন সে রকম প্রথা বজায় রাখতে চাইল। তাদের তা হতে বারণের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ ـ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ *

অর্থঃ- *আল্লাহ তা'আলার সমীপে না তার গোশ্ত পৌঁছে, আর না তার রক্ত, বরং তাঁর নিকট তোমাদের তাক্বাওয়া পৌঁছে থাকে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ঐ পশুগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর, যেহেতু তিনি তোমাদেরকে (কুরবানী করার) তাওফীক্ব দান করেছেন; এবং নিষ্ঠাবানদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।*

(সূরাঃ হজ্জ-৩৭)

ব্যাখ্যাঃ- ইরশাদ হচ্ছেঃ কুরবানী করার সময় খুব বড় রকম ভাবে আল্লাহর নাম ঘোষণা করতে হবে। এজন্যেই তো কুরবানীকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, যাতে তাঁকে সৃষ্টিকর্তা ও আহার্যদাতা স্বীকার করে নেয়া হবে। কুরবানীর গোশ্ত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। এতে তাঁর কোন উপকার নেই। তিনি তো সারা মাখলূক হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত। বান্দাদের হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী। অজ্ঞতা যুগের এটাও একটা বড় বোকামি ছিল যে, তারা তাদের মূর্তিগুলি সামনে রেখে দিতো এবং ওগুলোর উপর রক্তের ছিটা দিতো। এই প্রচলনও ছিল যে, তারা বাইতুল্লাহ শরীফের উপর রক্ত ছিটিয়ে দিতো। মুসলমান সাহাবীগণ এ সম্পর্কে প্রশ্ন

করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দৈহিক রূপের দিকে দেখেন না এবং তোমাদের দিকেও তাকান না। বরং তাঁর দৃষ্টি তো থাকে তোমাদের অন্তরের উপর এবং তোমাদের 'আমলের উপর।" অন্য হাদীসে রয়েছেঃ "দান-খায়রাত ভিক্ষুকের হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর হাতে চলে যায়। কুরবানীর পশুর রক্তের ফোঁটা যমীনে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। ভাবার্থ এই যে, রক্তের ফোঁটা পৃথক হওয়া মাত্রই কুরবানী কবূল হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

(ইবনু কাসীর)

ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য "لن ينال الله لحومها" বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কুরবানী একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌঁছে না এবং কুরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্যান্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাযে উঠা-বসা করা, রোযায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মুহব্বত বর্জিত ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিন্তু ইবাদতের শরীয়তসম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরী যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আদেশ পালনের জন্যে এ কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

---

(২) শানে নযূলঃ যখন শির্কের দরুণ কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাওহীদের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। তখন কারো মনে সন্দেহ হল যে, ইসলাম গ্রহণ করলে শির্কের অবস্থায় কৃত পাপসমূহ মাফ করা হবে কি না? না হলে ইসলাম গ্রহণ করে লাভ কি? নিম্নোক্ত আয়াতে এ সন্দেহের উত্তর দেয়া হয়েছে।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا - اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

অর্থঃ- আপনি বলে দিন যে, (আল্লাহ বলেন,) হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ (অতীতের) সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরাঃ যুমার-৫৩)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলঃ আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গুনাহ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবূল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুরতুবী)

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গুনাহ এমনকি শিরক ও কুফ্র থেকে তওবা করলেও তওবা কবূল হয়। সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহর রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

———※———

(৩) শানে নুযূলঃ- একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শির্ক খণ্ডনের উদ্দেশ্যে কুরাইশদেরকে বললেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য বাতিল উপাস্যদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। তাদের মধ্যে কেউ

কেউ বলে উঠল, তবে তো ঈসা (আঃ)-এর মধ্যেও মঙ্গল নেই। কেননা নাসারাদের এক সম্প্রদায় তাঁর উপাসনা করে থাকে, অথচ আপনি তাকে নবী বলে থাকেন। এর উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ - وَقَالُوْا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ - اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ *

অর্থঃ- আর যখন (ঈসা) ইবনু মারইয়ম সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর কথা বর্ণিত হল, তখন অকস্মাৎ আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা এতে (আনন্দে) চিৎকার করতে লাগল এবং তারা বলতে লাগল, আমাদের দেবতারা উত্তম না ঈসা (আঃ)? তারা যে আপনার নিকট এটা বর্ণনা করেছে, তা নিছক ঝগড়ার উদ্দেশ্যে। বরং তারা তো কলহ পরায়ণ জাতি, ঈসা তো কেবল এমন একজন বান্দা, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আমি তাকে বনী ইসরাঈলদের জন্য (স্বীয় কুদরতের) একটা দৃষ্টান্ত করেছিলাম।

(সূরাঃ যুখরুফ-৫৭-৫৯)

ব্যাখ্যাঃ- আলোচ্য আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, তারা হয় নিষ্প্রাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মূর্তি, না হয় প্রাণী; কিংবা নিজেই নিজের ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন, শয়তান, ফির'আউন, নমরূদ প্রভৃতি। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা, তিনি কোন সময়ই নিজের ইবাদত পছন্দ করতেন না। খ্রীষ্টানরা তাঁর কোন নির্দেশের কারণে তাঁর ইবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে,

আল্লাহ তা'আলা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খ্রীষ্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি সর্বদা তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোট কথা, ইবাদতে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত কাফিরদের আরও একটি আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন, (অর্থাৎ, ঈসা (আঃ) তাঁরও তো ইবাদত হয়েছে।) সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অপরের ইবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জওয়াব সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতেরও পরিপন্থী ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শির্কের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

*

(৪) শানে নুযূলঃ- কোন কোন মুশরিক প্রস্তর মূর্তির নামে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু ছেড়ে দিত এবং তার সম্মানার্থে তা হতে কোন প্রকার স্বার্থ ভোগ করা নিষিদ্ধ বলে মনে করত। এবং তাদের এ অপকর্মে আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ, মূর্তির সুপারিশের মধ্যস্থতায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করত। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا - وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ - اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ *

অর্থঃ- হে মানব! যা যমীনে রয়েছে তা থেকে হালাল পবিত্র জিনিষগুলো খাও, আর শয়তানের অনুসরণ করো না; বাস্তবিক সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরাঃ বাক্বারা-১৬৮)

ব্যাখ্যাঃ- 'তোমরা আমার এ অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না যে, আমি তোমাদের জন্য উত্তম ও পবিত্র জিনিসগুলো বৈধ করে দিয়েছি যা তোমাদের কাছে খুবই সুস্বাদু ও তৃপ্তি দানকারী। ঐ খাদ্য তোমাদের শরীর, স্বাস্থ্য এবং জ্ঞান বিবেকের কোন ক্ষতি করে না। আমি তোমাদেরকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করছি। কেউ কেউ যেমন শয়তানের পথে চলে কতকগুলো হালাল বস্তু তাদের উপর হারাম করে নিয়েছে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তোমাদের অবস্থাও তদ্রুপই হবে। সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি যে মাল-ধন আমার বান্দাদেরকে প্রদান করেছি তা তার জন্য বৈধ করেছি। আমি আমার বান্দাদের একত্ববাদী রূপে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শয়তান তাদেরকে এই সুদৃঢ় ধর্ম হতে সরিয়ে ফেলেছে এবং আমার বৈধকৃত বস্তুকে তাদের উপর অবৈধ করে দিয়েছে। (ইবনু কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ, হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দু'আ কবূল হয় না। তেমনিভাবে হালাল খানায় অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়, তদ্দারা অন্যায়-অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়; ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দু'আ কবূল হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রসূলগণের প্রতি হিদায়াত করেছেন যে.

"হে আমার রসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।"

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক 'আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দু'আ কবূল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবূল না হওয়ার

আশঙ্কাই থাকে বেশী। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ইরশাদ করেছেন, বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদিগার! ইয়া রব!' কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দু'আ কি করে কবূল হতে পারে? (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনুকাসীর)

*

(৫) শানে নুযূলঃ- ইয়াহুদী ও নাসারারা আল্লাহর জন্য সন্তান, আর মুশরিকরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করত। আর নক্ষত্র পূজক ও অগ্নি পূজকেরা বলত, আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধি না থাকলে তাঁর মর্যাদার হানী হবে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا*

অর্থঃ- *আর বলে দিন যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি না কোন সন্তান রাখেন, আর না তাঁর রাজত্বে কোন শরীক আছে, আর তাঁর মহত্ব বেশী বেশী বর্ণনা করতে থাকেন।* (সূরাঃ বনী ইসরাঈল-১১১)

ব্যাখ্যাঃ- এটি সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও তাওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিবৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (এক) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন দু'আয় 'ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান' বলে আহবান করলে মুশকিরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু'আল্লাহকে আহবান করেন। তারা বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত

অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন, অথচ নিজেই দু'উপাস্যকে ডাকেন। পূর্বের আয়াতে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কেবল দু'দুটো নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই সত্তা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযে উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং কুরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত। এর জওয়াব আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহ তা'আলার জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহর শরীক বলত। সাবিয়ী ও অগ্নিপূজারীরা বলত যে, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না থাকলে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব লাঘব হয়। এ দলত্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে।

*

(৬) শানে নুযূলঃ- আরবের মুশরিকরা উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক আল্লাহর জন্য এবং অপর অর্ধাংশ দেবতার জন্য নির্ধারণ করত। এরূপে গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তুও ভাগ করে কিছু আল্লাহর জন্য এবং কিছু দেবতার জন্য নির্ধারণ করত। আল্লাহর অংশ মেহমান এবং গরীবদেরকে দান করত। আর দেবতার অংশ প্রতিবেশী এবং চাকরদেরকে দিত। আল্লাহর অংশ উত্তম হলে দেবতার অংশের সাথে বদল করত। আর দেবতার অংশ উত্তম হলে তদবস্থায়ই রাখত। এবং বলত, আল্লাহ ধনী, তাঁর অংশ নিকৃষ্ট হলে কোন ক্ষতি নেই। আর আল্লাহর অংশ হতে কিছু জিনিস দেবতার

অংশের সাথে মিশে গেলে সবটুকুই দেবতার জন্য রাখত এবং বলত এরা অভাবী। তাদের এ আচরণই আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেন।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا - فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ - وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ - سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ *

অর্থঃ- *আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) তার কিছু অংশ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা মতে বলে, তা তো আল্লাহর, আর এটা আমাদের দেবতাদের। অনন্তর যে অংশ তাদের দেবতাদের হয়, তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছেনা, আর যে অংশ আল্লাহর (নামে) হয়, তা তাদের দেবতাদের দিকে পৌঁছে যায়। তারা কতই না মন্দ ব্যবস্থা করে রেখেছে।* (সূরাঃ আনআম-১৩৬)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানী হত, তার এক অংশ উপাস্য দেব-দেবীর নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহর নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হত এবং দেব-দেবীর অংশ মন্দিরের পূজারী, সেবক ও রক্ষকদের জন্যে ব্যয় করত।

প্রথমতঃ এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদেরকে অংশীদার করা হত। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহর অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত, আল্লাহ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর

প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোন সময় এমনও হত যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোন বস্তু আল্লাহর অংশে মিশে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্যে সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর অংশ থেকে কোন বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে মিশে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলতঃ আল্লাহ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কুরআন কারীম তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছে ঃ "তাদের এ বিচারপদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একপেশে। যে আল্লাহ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমতঃ তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে, তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছল-ছুতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে।"

---

(৭) শানে নুযূলঃ- প্রতিমা পূজার অসারতা প্রমাণিত হলে, তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভয় প্রদর্শন পূর্বক বলতে লাগল, তুমি আমাদের দেবতাদের নিন্দা করছো, তারা অবশ্যই তোমার উপর কোন বিপদ আনয়ন করবে। এর প্রতিবাদে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَا - اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَا - اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَا - اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا - قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنَ *

অর্থঃ- *তাদের কি পা আছে যদ্বারা চলতে পারে? অথবা তাদের কি হাত আছে যদ্বারা কোন কিছু ধরতে পারে? বা তাদের কি চক্ষু আছে যদ্বারা দেখতে পায়? বা তাদের কি কর্ণ আছে? যদ্বারা শুনতে পায়? আপনি বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের সকল অংশীদারকে ডেকে পাঠাও অতঃপর*